হইল। এক্ষণে ইহা পাঠে যদি পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে একজনও যৎকিঞ্চিৎ উপকার বা তৃপ্তি লাভ করেন, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক ও অভিলাষ পূর্ণ হইল মনে করিয়া, আমি কৃতার্থ হইব। পরিশেষে যে বন্ধু নিঃস্বার্থভাবে এই পুস্তক খানি প্রকাশ করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম ও কষ্ট বহন করিয়াছেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

কুচবিহার।
কার্ত্তিক, ১৩০০। } গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

জীবন-সন্দর্ভ

প্রথম-ভাগ।

চিন্তা।

চিন্তা কার্য্যের প্রসূতি-স্বরূপ। যে ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্য্য না করে, অথবা সংযতমনা প্রশান্ত-চিত্ত বিবেকী না হয়, তার কার্য্য তাদৃশ সফলতা লাভ করে না। মনুষ্যের কীর্ত্তির স্থায়িত্ব, জীবনের সারত্ব ও চরিত্রের মহত্ব এই চিন্তা বা ভাবরূপ উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া তাহার কর্ম্মক্ষেত্রে নানা আকারে প্রকাশিত হয়। ভাবুকের ভাব বুঝা সহজ ব্যাপার নহে। স্থূলদর্শী মনুষ্য ভাবুকতাকে কল্পনা এবং চিন্তাশীল ভাবুককে অলস, অকর্ম্মণ্য বলিয়া উপহাস করিতে পারে, কিন্তু চিন্তা যে আদি শক্তি—নিরাকার শক্তি ;—সমুদয় বাহ্যশক্তির পরিচালক, ইহা জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী মাত্রই স্বীকার করিবেন। বজ্রের ভীমনিনাদে বধিরের বিকম্পিত হওয়া সম্ভব হইতে পারে, বিদ্যুতের চাক্‌চিক্যে অন্ধ ব্যক্তির চমকিত হওয়া সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সুধীর বিজ্ঞানবিৎ প্রবীণ পণ্ডিত ভিন্ন মাধ্যাকর্ষণ বা তাড়িতের গভীর প্রচ্ছন্নশক্তির মর্য্যাদা অন্য কোন ব্যক্তির বোধগম্য হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। বুদ্ধ কি রাজপুত্র বলিয়া এত বিখ্যাত হইলেন? চৈতন্য কি মহাপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া চিরস্মরণীয়? সূত্রধরের পুত্র ঈশা—যাঁহার পদ মান মর্য্যাদা পূর্ব্বে কিছুই ছিল না,—

তিনিই বা কেন এত মান্য ও পূজনীয় হইলেন? আবার দেখ, বাষ্পযন্ত্র, তাড়িত-বার্ত্তাবহ প্রভৃতি চিন্তামূলক কার্য্য যাঁহারা উদ্ভাবন করিলেন, তাঁহারাই বা কিসের জন্য এত খ্যাতনামা হইলেন। এই সকল কীর্ত্তিস্তম্ভ কি চিন্তাদেবীর প্রসাদাৎ নহে?

সংসর্গ অনুসারে যেমন মনুষ্যচরিত্র জানা যায়, তেমনি চিন্তাদ্বারা তাহার জীবনের সারত্ব বুঝা যায়। কেননা যেমন তাহার জীবন, যেমন তাহার চিন্তা, তেমনি তাহার কার্য্য ও আচরণ, সাধারণতঃ ইহা দেখা যায়। কার্য্যবিহীন চিন্তা কল্পনা মাত্র। ভাল চিন্তা জীবনকে ভাল করে, অসার চিন্তা তাহার জীবনকে অসার ও অকর্ম্মণ্য করে। আমাদের বিদ্যালাভ অনেক হইয়াছে বটে, কিন্তু আমরা আজও চিন্তাশীল হই নাই; ভালরূপে চিন্তা করিতে শিক্ষা করি নাই। উৎসের বেগশক্তি যেমন স্রোতস্বতীকে পরিচালিত করে, চিন্তাবেগ তেমনি আমাদিগকে কার্য্যশীল করিয়া তুলে। কার্য্যফল চিন্তার পরিচায়ক। আমরা সার গভীর চিন্তা করিতে শিখি নাই, এজন্য আমাদের কার্য্য তাদৃশ স্থায়ী সাদ্ভাব ধারণ করে না। লোকে যৌবনের উৎসাহ উদ্যমের স্রোতে পড়িয়া কার্য্য-ভার গ্রহণ করে—প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ হয়—ব্রতাদি অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, অথবা কার্য্যকুশলতার আশা ভরসা দেখায় বা ধারণ করে, কিন্তু এ সকল কার্য্যের মূল যে চিন্তা, তাহা পরি-পক্ক ও সুদৃঢ়রূপে প্রকৃতিগত না হওয়াতে, কার্য্যকালে যে অস্থির ভাবের পরিচয় দেয়, ইহার প্রমাণ বিরল নহে। বঙ্গীয় যুবক কথায় প্রবীণ, কার্য্যে ক্ষীণ, ইহা একপ্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত

হইয়া উঠিয়াছে। আমরা অন্যের চিন্তা অনুকরণ করি, নিজে চিন্তা করিতে শিক্ষা করি না, ইহাই আমাদের বিষম দোষ। চিন্তা যদি সৎ হয়, আর সে চিন্তা কাহারও প্রাণের সামগ্রী হয়, কি সে ব্যক্তি তাহাকে বিদায় দিয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারে? সাধু সজ্জনেরা তাঁহাদের প্রাণের ভাবকে কখন বিনাশ করিতে দেন নাই, তাঁহারা তাঁহাদের ভাবের জন্য প্রাণ দেন, তথাপি ভাবের অপলাপ হইবে, ইহা কখন সহ্য করেন না। সুতরাং তাঁহাদের কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হয়। বাস্তবিক চিন্তাশীল না হইলে চরিত্র গঠন হয় না, এবং চরিত্রবিহীন জীবন মনুষ্য-নামের গৌরবের অধিকারী হইতে পারে না, এজন্য চিন্তা প্রকৃতিগত—প্রত্যয়সিদ্ধ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা তাহার কার্য্য ফলপ্রদ হয় না। আমাদের চিন্তা এইরূপ সাধনে সিদ্ধ হয় না, সেইজন্য অনেক সময় আমরা আমাদের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে সমর্থ বা সাহসী হই না, এবং জ্ঞান সত্ত্বেও অনেক সময় অজ্ঞানীর মত কার্য্য করি। এইরূপ ভাবও কাজের তারতম্য হেতু, আমাদের মানসিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই দুর্ব্বলতা আমাদিগকে কপটাচারী ছদ্মবেশী সাহসবিহীন করে, এবং এই সকল ব্যবহারই আমাদের জাতীয় অধঃপতনের একটী বিশেষ কারণ। এত সভাসমিতি, এত বক্তৃতা উপদেশাদি হইতেছে, তথাপি আমাদের ভাবের দৃঢ়-তার এত অপ্রতুল কেন? ইহার কারণ, আমরা মনে করি, যে আমাদের চিন্তা আজও আত্মজাত বা জাতিগত অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই।

আমরা চিন্তাশীলতার বিষয় শিক্ষা বা আলোচনা করি

না; তবে চিন্তা বা ভাবুকতার আদর করিতে অথবা ভাবুক-দিগকে মর্য্যাদা দিতে কেনই বা পারিব? এই অসদ্ভাব জন্যই আমরা আত্মমহত্ব জানিতে অক্ষম। যে ব্যক্তি মহত্ব কি তাহা জানে না, সে কেমন করিয়া মহৎ হইবার আশা করিবে? মূল কথা,—এই গূঢ় অভাবপ্রযুক্তই আমরা পরস্পরের গুণগ্রহণ, অথবা পরস্পরের সহিত সমানুভূতি করিতে পারি না। ইহাই জাতীয় একতার বাস্তবিক প্রতিবন্ধক বলিয়া আমরা মনে করি। এই একতার অভাব যে, আমাদের অবনতির কারণ ইহা বোধ হয়, সকলেই মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিবেন। মুখস্থ ও পরকীয় জ্ঞান আমাদের যথেষ্ট হইয়াছে, এবং তজ্জন্য বাহ্য সভ্যতার আড়ম্বর ও অভি-মান আমরা বিলক্ষণ শিখিয়াছি, কিন্তু স্থূলদর্শী হইয়া মূলে ভুল করিলে কখনই মঙ্গল হইবে না। কেবল বাহ্যাড়ম্বর ও লোক-লজ্জা-পরবশ হইয়া, সত্যকে কল্পনা ও কল্পনাকে সত্য, এবম্প্রকার আচরণে আর সভ্যতা রক্ষা হইবে না। তত্ত্বরত্নখনি,—ভগবান মনুষ্য প্রকৃতির ভিতর নিহিত করিয়া দিয়াছেন; চিন্তাদ্বারা তাহা আবিষ্কার করিয়া, সেই রত্নলাভ কর; তাহা লাভ হইলে, আর দীনহীন কাঙ্গালের মত পরমুখাপেক্ষী হইয়া কষ্টভোগ করিতে হইবে না। ক্ষুদ্র নীচাশয়তা সঙ্কীর্ণ-প্রাণ অথবা ভয়বিভীষিকা দ্বারা লজ্জিত করিতে পারিবে না। অতএব হে মানব! এই স্থূল সাকার জগৎকে অসার জানিয়া, সূক্ষ্ম সার নিরাকার জগতের শোভা চিন্তাযোগে সম্ভোগ করিয়া, চিরসুখে সুখী হও। "চিন্তাজ্বরঃ মনুষ্যাণাম্" ইহা অসার, চিন্তা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু চিন্তামণির চিন্তা

বিনা চিন্তা না হয় নিধারণ;—ইদংহি সাধু-বচনম্;—ইহাই অনুসরণ কর; শান্তি পাইবে।

মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্য।

আমরা সৃষ্টির প্রক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, সমুদয় পদার্থ ও প্রাণী একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। বীজ হইতে বৃক্ষ, অণ্ড হইতে শাবক ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া কার্য্য-ফল প্রকাশ করিয়া আবার অন্তর্হিত হয়; ইহাকে উক্ত বীজের বা অণ্ডের নিয়তি বলে। এই নিয়তি-চক্রে সমুদায় সৃষ্টির ব্যাপার ঘুরিয়া স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। এই প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করিতে পরম-নিয়ন্তা কর্ত্তৃক সকলেই বাধ্য; এবং এই বাধ্যতা আশ্রয় ও আশ্রিতের সম্বন্ধ প্রতিপন্ন করিতেছে। যখন সকলেই এই নিয়তির অনতিক্রমণীয় নিয়ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তখন মনুষ্য কি ইহার অতীত? মনুষ্য কি এ নিয়মাধীন নহে? মনুষ্যপ্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মানুষেরও এই প্রকার নির্দ্দিষ্ট গতি নির্দ্ধারিত আছে। অন্যান্য পদার্থ বা প্রাণী যেন অন্ধ শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করে, কিন্তু মনুষ্য জ্ঞান-সহকারে স্বাধীন-ভাবে এই মহাশক্তিশালী অনন্ত পুরুষের সেবায় রত হইবে, এই তাহার প্রকৃতির লক্ষণ, এবং এই লক্ষণই স্রষ্টার সহিত তাহার যে সম্বন্ধ কি, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছে। বাস্তবিক মনুষ্য মঙ্গলময় বিধাতাকর্ত্তৃক এই ভবের অভিনয়-ভূমিতে আনীত—পৃথিবীর কার্য্যক্ষেত্রে

প্রেরিত। এখন স্থির ভাবে চিন্তা করিলে ইহা সহজে উপলব্ধি হইবে যে, মনুষ্য আনীত বা প্রেরিত হওয়াতেই মূলে এক উদ্দেশ্য নিহিত আছে; সেই উদ্দেশ্য-পালন মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য বলিয়া বাচ্য। মঙ্গলময় স্রষ্টার সহিত সৃষ্ট মনুষ্য-জীবনের যে কি সম্বন্ধ, তাহা এই লক্ষ্যই প্রতিপন্ন করিতেছে এবং এই সম্বন্ধ তাহার জীবনের দায়িত্ব-জ্ঞানকে বিকশিত করে। আমরা দেখি যে, মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিল, ক্রমে কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল, এবং তাহার কার্য্য যেন শেষ হইতে না হইতে তাহাকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইতে হইল, সুতরাং ইহাতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, এ পৃথিবী তাহার চির আবাস-ভূমি অথবা চির কার্য্যক্ষেত্র নহে, এবং সে যখন অনিচ্ছা সত্বেও চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়, তখন ইহা বেশ বুঝা যায় যে, সে এক অপর কোন শ্রেষ্ঠ শক্তির অধীন বা আশ্রিত। যখন ইহা স্থির হইল যে, ঈশ্বর মনুষ্যের আশ্রয় ও মনুষ্য তাঁহার আশ্রিত, তিনি তাহার প্রভু ও সে তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী সেবক,—যখন এই সম্বন্ধ দাঁড়াইল, তখন ইহা মান্য করা বা বজায় রাখা তাহার জীবনের শেষ কার্য্য ও এক মাত্র উদ্দেশ্য। এই জন্য শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন—

> স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ
> সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা। তদ্‌যথা রথনাভৌ চ
> রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতাঃ। এবমেবাস্মিন্নাত্মনি
> সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ।
>
> [বৃহদ্‌রণ্যকোপনিষৎ]

"সেই এক পরমাত্মা সকলের অধিপতি ও সকলের রাজা, যেমন রথচক্রের নাভিদেশে ও নেমিদেশে আর সকল সংযুক্ত থাকে, তদ্রূপ এই পরমাত্মাতে সমুদায় প্রাণী ও সকল আত্মা সমর্পিত রহিয়াছে।"

ঈশ্বরের সহিত মনুষ্য যে সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ তাহা চির-সম্বন্ধ—তাহা অকাট্য। এই সম্বন্ধই তাহার কর্ত্তব্যের মূল—ইহাতেই তাহার সমুদায় কর্ত্তব্যের সমষ্টি। যে পরিমাণে তাহার সম্বন্ধ-জ্ঞান বিকশিত হইবে, সেই পরিমাণে সে আপনার জীবনের কর্ত্তব্য সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। সম্বন্ধ-জ্ঞানালোক কর্ত্তব্য-ভাবের বিকাশক, এবং এই কর্ত্তব্যের সমষ্টিই ধর্ম্ম। মনুষ্যকে ধর্ম্মপরায়ণ হইতে হইলে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সমগ্ররূপে সম্পাদন করিতে হইবে। এখন স্থির ভাবে আলোচনা করিলে ইহা সহজে উপলব্ধি হইবে যে, ধর্ম্মই মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সাধন করাই তাহার সমস্ত কার্য্যের উদ্দেশ্য। অতএব এই লক্ষ্যকে স্থির রাখিয়া যত সে কার্য্য করিবে, ততই সে জীবনে সফলতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। সমগ্রশক্তি, ইচ্ছা ও চেষ্টা সহকারে যতই সে কায়মনোবাক্যে তাহার প্রভুর আজ্ঞাবহ থাকিবে, ততই তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিয়া সুখী হইবে। এই তাহার প্রকৃতি, এই প্রকৃতি অনুসারে চলাই তাহার নিয়তি।

ইহা সত্য বটে যে, এ পৃথিবীতে অবস্থা, কার্য্য ও রুচি প্রভৃতির অনেক ভিন্নতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু এ ভিন্নতা সাময়িক, আকস্মিক অথবা বাহ্যিক, এ সকল ভিন্নতা সত্ত্বেও মনুষ্য

জীবনের লক্ষ্য একই। অবস্থাদি দ্বারা তাহা কথনই অতিক্রান্ত হইতে পারে না; কেননা ইহা তাহার প্রকৃতির গভীর অভ্যন্তরে নিহিত। আপাততঃ যে ভিন্নতা দেখা যায়, তাহাও অবস্থা ও সাধন-সংঘটিত। মনুষ্য-সমাজে এই বিচিত্রতা—এই বাহ্যিক ভিন্নতা সত্ত্বেও, কেবল এই লক্ষ্য সম্বন্ধেও এই নিয়তি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সমস্ত জাতি একই মনুষ্য নামে অভিহিত হইল, এবং অপর প্রাণীপুঞ্জের মত জরা মৃত্যু ও প্রবৃত্ত্যাদির অধীন হইয়াও মনুষ্য অমরত্ব—দেবত্বের অধিকারী হইল। আমাদের ইহা বোধ হয়, এ সম্বন্ধে বুদ্ধি-ভ্রংশ অথবা লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হওয়াতেই কোন কোন তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত সম্বন্ধ-বিধিকে উল্টা পাল্টা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মহা-ভ্রমে পড়িয়াছেন; নরের বিকৃত অবস্থাকে বানর শব্দে ব্যাখ্যা করিলেও বরং শোভা পাইত, কিন্তু তাহা না করিয়া বানরের উন্নতির-ক্রম যে নর তাহা প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন!

মানব-ইতিহাস পর্য্যালোচনা ক[illegible]া অবগত হওয়া যায় যে, যে পরিমাণে মনুষ্য-মণ্ডলী-বিশেষে এই লক্ষ্য গূঢ়ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সেই পরিমাণে সেই মনুষ্যমণ্ডলী উন্নতি ও সভ্যতার উচ্চ সোপানে অধিরূঢ় হইতে সমর্থ হইয়াছে। পক্ষান্তরে ইহার অন্যথাচরণ যে বিপরীত ফল প্রসব করিবে ও করিয়াছে, ইহা অনিবার্য্য। কোন কোন সম্প্রদায় জীবনের অস্থিরতা সম্বন্ধে যেন স্থির নিশ্চয় হইয়া আমোদপ্রমোদ ও বিলাসাদিতে জীবন অতিবাহিত করিতে উদ্যত হইয়া ইহার বিষময় ফলের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। কেননা প্রভুর

অবমাননা অথবা আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া সেবক কি তাঁহার প্রসন্নতা পাইয়া সুখী হইতে পারে? অথবা প্রকৃতি-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-প্রণালী অতিক্রম করিয়া, কেহ কি প্রকৃত নিত্যানন্দ উপভোগ করিবার আশা করিতে পারে? কথিত আছে যে দেবতারা সমুদ্র-মন্থন পূর্ব্বক অমৃত লাভ করিয়াছিলেন, ও তদ্দ্বারা অসুরদিগকে জয় করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক মনুষ্য-প্রকৃতি-রূপ প্রকাণ্ড সাগর মন্থনে ইন্দ্রিয়াদি রূপ অসুরদিগকে জয় করিলে মনুষ্য দেবত্ব লাভ করে। এতদ্দ্বারাই আর্য্যকুল এত গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, প্রভৃতি ঋষি মুনি ও দেবতাগণ সমুৎপন্ন হইয়া আর্য্যকুলকে যে মহিমান্বিত ও বিখ্যাত করিয়াছিলেন, এই লক্ষ্য সাধনই তাহার একমাত্র কারণ।

মনুষ্য-জীবন এই লক্ষ্যকে মধ্যবিন্দু করিয়া কাজ করিলে, তাহার সমুদয় কার্য্য একটী সুন্দর সামঞ্জস্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া অতি মনোহর ভাব প্রকাশ করে। ঈশ্বরকে [illegible] মনুষ্য জীবনের মধ্য-বিন্দু রূপে নির্দ্ধারণ করে, তাহা [illegible]লে তাহার সমুদায় কর্ত্তব্য সমসূত্রে গ্রথিত হইয়া কার্য্যফল এক অপূর্ব্ব সমন্বয়-ভাব ধারণ করে এবং সেই সমন্বয় জীবনের সমস্ত বিভাগে ঐক্যতান সমুপস্থিত করিয়া সকল বৈপরীত্য বিনাশ করে। যেখানে এবম্বিধ বিঘ্নাত্মক উপাদান সমস্ত বিলুপ্ত হয়, সেখানেই শান্তি ও নিশ্চিন্ততা প্রসূত হইয়া থাকে। ঘড়ি যেমন বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রে সংরচিত হয়, অথচ তাহারা প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া এক পরিচালন (পেণ্ডুলম্) শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রহর-পল শলাকা দ্বারায় সময় নিরূপিত

করিয়া কার্য্যকুশলতা দান করে, তদ্রূপ মনুষ্য-জীবন-যন্ত্র যদি লক্ষ্য-শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া ভাব ও কার্য্যযোগে কর্ম্মক্ষেত্রে চলিতে থাকে, তাহা হইলে ব্যবহার ও আচরণাদিতে স্বাভাবিক একটী সুশৃঙ্খলা সহজে সংস্থাপিত হয়। ঘড়ি সম্বন্ধে উক্ত শলাকাদ্বয় পরিণামে যেমন বিভিন্ন গতি পরিত্যাগ করিয়া যথা সময়ে সন্ধি-যোগাভাস প্রকাশ করে, মনুষ্য জীবন-চক্র ভাব ও কার্য্য-সূত্রে—সাধন ও কৃপা যোগে মুক্ত হইয়া মহাসিদ্ধি-যোগ লাভ করে। নদী যেমন সাগরে মিলিত হইয়া সমন্বয়-সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করে, জীবাত্মা পরমাত্মাতে অনুপ্রাণিত হইয়া, মনুষ্য-জীবনকে তদ্রূপ যোগাভাসে বিবশ করিয়া এক অত্যাশ্চর্য্য স্বর্গীয় কান্তি প্রকাশ করে। আরও দেখ, বাদ্যযন্ত্রের প্রত্যেক যন্ত্র তাদৃশ মধুর সুর প্রদান করে না, কিন্তু তাহারা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়োজিত হইয়া পরস্পর সুরে সুর মিলাইয়া, সুমধুর সুমিষ্ট সঙ্গীত উদ্ভাবন করিয়া, শ্রোতৃবর্গের মন বিমোহিত করে। তদ্রূপ মনুষ্যের প্রবৃত্তিনিচয় যখন এক লক্ষ্য যোগে যুক্ত হইয়া মিলিত ভাবে কার্য্য করে, তখন বিবাদ বিসম্বাদের ঝঞ্ঝাট হইতে মনুষ্য নিষ্কৃতি পাইয়া, তাহার জীবনে উত্তরোত্তর স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে থাকে। এই স্ফূর্ত্তিই আনন্দ; ইহাই পরম প্রার্থনীয় শান্তি ও আরাম। মনে কর, মনুষ্য-জীবন এক চক্রের ন্যায়, ঈশ্বর তাহার মধ্যবিন্দু এবং সেই চক্রের পরিধি তাহার কর্ম্মক্ষেত্র বা কর্ত্তব্যশ্রেণী। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, চক্রের মধ্যবিন্দু হইতে যত রেখা পরিধিকে স্পর্শ করে, তাহারা পরস্পর সমান;

সেইরূপ ঈশ্বরকে জীবনের মধ্যবিন্দু রূপে নির্দ্দেশ করিয়া জীবন-চক্রের পরিধি-রূপ কার্য্যক্ষেত্রে যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অথবা যে কোন অবস্থাতে অবস্থিতি করা যাউক না কেন, সমস্তই সমযোগে আবদ্ধ; কেহ কাহাকে অতিক্রম করিবার ভূমি প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং সকলেই সেই এক লক্ষ্যের পরিপোষক হয়। মাধ্যাকর্ষণ যেমন সকল আকর্ষণকে সমাবেশ করিয়া সৃষ্টির সুশৃঙ্খলা সংরক্ষণ করিতেছে, তদ্রূপ এই লক্ষ্য বা মধ্যবিন্দু-যোগ মনুষ্য জীবনের সমস্ত কার্য্য-বিভাগে সমযোগ আনয়ন করে। এতদাবস্থায় আমোদ প্রমোদ, আহার বিহার, অথবা ধনোপার্জ্জন বা বিষয় কার্য্যাদি, যাহা সচরাচর নীচ ও অপকৃষ্ট বলিয়া বিখ্যাত, এবং যাহা মায়া মুগ্ধ বা মোহান্ধ করিয়া মনুষ্যকে অবসাদ বা বিড়ম্বনাগ্রস্ত করে,—আর ঈশ্বরোপাসনা ও পরোপকারাদি কার্য্য, যাহা ধর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট কর্ম্ম বলিয়া মনুষ্যকে এত গৌরবান্বিত করে—এই উভয়বিধ কার্য্যই তখন এক কর্ত্তব্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া, স্বর্গীয় সামঞ্জস্য সংরক্ষণ করিয়া কেমন এক অলৌকিক ও অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করে; তখন নিকৃষ্ট বৃত্তি ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি যদ্দারা মনুষ্য-প্রকৃতি মঙ্গলময় বিধাতা কর্ত্তৃক সংরচিত হইয়াছে, পরস্পর পরস্পরের শাসন ও অনুসরণ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহায়রূপে পরিচালিত হইতে থাকে; সুতরাং বিপর্য্যয় সংঘটিত হওয়া অসম্ভব হয়। দিগ্দর্শনের শলাকার ন্যায় লক্ষ্যবিশিষ্ট-মনুষ্য-জীবন সকল অবস্থাতে কেবল ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি ঠিক করিয়া রাখে এবং গ্রহগণ

যেমন সূর্য্যকে চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, অথচ তাহাদিগের স্বীয় নির্দ্দিষ্ট পথ কখনও অতিক্রম করে না, তদ্রূপ মনুষ্য ঈশ্বরকে মধ্য-বিন্দু করিয়া কার্য্য করিতে সঙ্কল্প করিলে, সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতে ঈশ্বরাধীন থাকিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করে। এই রূপে কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের আজ্ঞা সমগ্র ও সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে সম্পন্ন করা—অথবা তৎ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হওয়াই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য—ইহাই তাহার সাধন—ইহাই তাহার লক্ষ্য। ইহাই চরম গতি, ইহাতেই তাহার মুক্তি, শান্তি ও নিত্য সুখ;—ইহাই তাহার আনন্দ ও পরম ঐশ্বর্য্য।

কর্ত্তব্য কর্ম্ম

প্রকৃত মনুষ্য জীবন কি—কোন উপকরণে তাহা গঠিত? এবিষয়ে সংক্ষেপে বা এক কথায় সদুত্তর দিতে হইলে, এই বলা যায় যে, কর্ত্তব্যের সমষ্টিসাধনই প্রকৃত মনুষ্য জীবন। কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমূহ জীবন হইতে যদি বাদ দেওয়া যায়, তবে আর জীবনে থাকে কি? কোন পদার্থের সারাংশ বাদ দিলে যেমন তাহা অসার—অপদার্থ বাচ্য হয়, তাহার আর তাদৃশ মূল্য বা আদর থাকে না, মনুষ্য জীবন তদ্রূপ কর্ত্তব্য-শূন্য হইলে তাহাও সেইরূপ অসার হয়। যে ব্যক্তি সমস্ত কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সুচারু রূপে সম্পন্ন করে, তাহার যশঃ-সৌরভ কেমন সহজে যেন বায়ু হিল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে এবং শুধু যে সে এই বাহ্য সৌরভে আমোদিত

হইবার সুযোগের অধিকারী হয়, তাহা নহে ; তাহার হৃদয়োত্থিত আত্মপ্রসাদ তাহাকে কেমন সদা প্রফুল্ল-চিত্ত করিয়া রাখে!

পাতাল-নিঃসৃত-উৎস-বারির সহিত মেঘমালা-বিনিঃসৃত বর্ষার জলরাশি সরোবরে সম্মিলিত হইলে যেমন সে সরোবরের শোভা বিকাশ করে,—তদ্রূপ কর্ত্তব্য-পরায়ণ জীবনে, অন্তরে আত্মপ্রসাদ ও বাহিরে যশঃসৌরভ উভয় একাধারে মিলিত হইয়া কেমন এক অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করে! কিন্তু কেমন বিপরীত সেই ব্যক্তির জীবন, যাহাতে কর্ত্তব্য কার্য্য সাধিত হয় না! আমরা নিত্য-ঘটনা অবলোকন করিয়া এবিষয়ে যে কত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকি,—কত উদাহরণ দেখিতে পাই, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যেখানে নিন্দাবাদ, অপবাদ,—তাহার মূলে প্রায়ই কর্ত্তব্যের অভাব, অনাদর বা শিথিলতা সদা বিদ্যমান, তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। ইহা সত্য বটে, কর্ত্তব্যসাধন-সত্ত্বেও জনসাধারণের কুসংস্কার বা অজ্ঞানতা নিবন্ধন কখন কখন ব্যক্তিবিশেষকে নিন্দিত হইতে হয়, কিন্তু পদ্মের গন্ধ না থাকিলেও একই তার প্রচুর মধুভাণ্ডের মিষ্টাকর্ষণে ভ্রমর যে মুগ্ধ। তাই যদিও কর্ত্তব্যকর্ম্মের সৌরভ, স্থান বা লোক বিশেষের ব্যবহার-হিল্লোলে ব্যাপ্ত না হউক, কিন্তু তাহার আত্মপ্রসাদ রূপ মধুরাশি কে হরণ করিবে? এই জন্য কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক যথাকালে যথোচিত আদর লাভ করিয়া থাকেন।

ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে মনুষ্য-জীবন কর্ত্তব্যের সমষ্টি।

যত তাহাতে কর্ত্তব্য সাধিত হইবে, ততই তাহা সারবান। এই কর্ত্তব্যকর্ম্ম—বিবিধ—বিচিত্র। এই বিবিধ কর্ত্তব্য পালনে আমাদের জীবনের উন্নতি-সদ্গতি ও শান্তি। যে পরিমাণে এই কর্ত্তব্যরাশি সদ্ভাবে ও সম্যক রূপে সম্পন্ন হইবে, ততই জীবনের বিকাশ ও বিস্তার। কর্ত্তব্যের চাপে যে প্রাণ ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর ছিল, তাহা আবার প্রশস্ত ও নিঃস্বার্থ ভাবাপন্ন হইয়াছে, ইতিহাস ইহার বিস্তর বৃত্তান্ত প্রদান করিতেছে। মানুষ মোটামোটি জীবনের পরিধি-ভূমিতে আগে আপনাকে দেখে, পরে অন্যকে দেখে, এবং সেই পরিধির মধ্য-বিন্দু যে ঈশ্বর তাহা দেখিতে পায় না। এই জন্য সংসার-ক্ষেত্রে কর্ত্তব্যের স্থূল কার্য্য এইরূপ নির্দ্ধারিত হয়, যে প্রথমে "আত্ম-রক্ষা"। এই আত্মের বিস্তৃত অর্থ কখন কখন আমি ও আমার আত্মীয়বর্গ ভিন্ন অন্য বুঝায় না, তজ্জন্য সংসারাসক্ত স্থূলদর্শী লোকেরা আপনার ও আপনার আত্মীয়বর্গের প্রতি কর্ত্তব্য কার্য্যকেই কর্ত্তব্য-সাধনের চূড়ান্ত স্থল মনে করে। এই ভাবকে সঙ্কীর্ণ করিয়া অবস্থা ও ব্যক্তি বিশেষে কর্ত্তব্য-বিভ্রাট সংঘটন করা হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কর্ত্তব্য শ্রেণী তিন মহাভাগে বিভক্ত; অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি, আপনার প্রতি ও মনুষ্য সাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা পিতামাতাকে আদর সমাদর শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকি, বন্ধুবান্ধবকে স্নেহ ভালবাসা দিই, আত্মীয় স্বজনের ভার বহন করি, আশ্রিত-জনগণকে আশ্রয় দান ও সন্তানসন্ততিকে প্রতিপালন করি; রাজার অনুগত থাকা ও তাঁহাকে সম্মান দেওয়া উচিত মনে করি—

ইত্যাদি। যদি এ সকল কর্ত্তব্যসাধন করা আমাদের জীবনের অবশ্য নিত্য প্রতিপাল্য কার্য্য হইল, এবং না করিলে যদি প্রত্যবায় হয়, তবে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য যদি জীবনে প্রতিপালন না করি, তবে কি বিশেষ রূপে অপরাধী হইব না? পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, রাজা ও মনুষ্য সাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য-সাধন নিত্য ও অবশ্য প্রতিপাল্য কার্য্য হইল, তবে ইহা অপেক্ষা যে বিশেষ কর্ত্তব্য-সাধন করা আমাদের আবশ্যক, তাহা যদি সাধন না করা হয়, তবে সে জন্য আমা-দিগকে কত অপরাধী হইতে হয়। পিতার পিতা, মাতার মাতা, আত্মীয় হইতে পরমাত্মীয়, রাজার রাজা, সর্ব্বসুখদাতা জীবনদাতা যে মহান্ পুরুষ মঙ্গলদাতা বিধাতা, তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য-সাধন করা তবে কত আবশ্যক, তাহা কত গুরুতর কার্য্য, একবার কি আমরা তাহা নিত্য স্মরণ ও সাধন করিব না? কিন্তু দেখিতে গেলে এবিষয়ে আমরা কত শিথিল! আমারা লোক-ভয়ে—পিতামাতাকে অগ্রাহ্য, রাজাকে অতি-ক্রম ও আত্মীয় সকলকে উপেক্ষা করিতে সাহসী হই না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যাহা হইতে আমি ও আমার বাপবার সব পাইলাম, তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্যসাধনে আমরা কেমন পরাঙ্মুখ! আমরা সেই জন্য আমাদের পাঠকবৃন্দকে অনুরোধ করি,—যেন তাঁহারা এবিষয়টী বিশেষ রূপে অনুধাবন করেন। কেননা মূল ছাড়িয়া আর সব যাহা কিছু সমস্তই প্রকাণ্ড ভুল। ডাক.—ব্যাকুল ও কাতর ভাবে ডাক; যে ভগবানকে এখন বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না, তাঁহাকে ,ডাকিতে ডাকিতে দেখিবে,—তোমার কাতর ডাক শুনে,—যেমন সন্তানের

ক্রন্দনে মাতৃপ্রাণ ব্যাকুল হয়, দেখা যায়,—তাহা অপেক্ষা সেই বিশ্বজননী দয়াময়ী মার প্রাণ তোমার আমার জন্য ব্যাকুল, ইহা ডাকিতে ডাকিতে জানিতে, ও সাধন করিতে করিতে লাভ করিতে পারিবে। অতএব দিনান্তে নিশান্তে অবসরকালে একান্তে প্রত্যেক নিশ্বাসপ্রশ্বাসে তাঁহাকে জীবনের জীবন বলিয়া ডাক; অন্ধকার অবিশ্বাস সংশয় সব দূরে যাইবে, ও নবজীবন নবভাব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

পরীক্ষা ও শিক্ষা।

পরীক্ষা ভয়ের বিষয়, ইহা সাধারণ সংস্কার; কিন্তু গূঢ়ভাবে দেখিলে—সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে, ইহা প্রতীত হইবে যে, এই পরীক্ষাই আবার শিক্ষার উপায়—উন্নতির সহায়। এই যে সংসারে নানাবিধ পরীক্ষা, ইহাতে কি আমাদিগকে সাবধানতা শিক্ষা দেয় না? ইহা কি আমাদিগকে বিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞতা প্রদান করে না? এই যে শিক্ষার উপায়-স্বরূপ পরীক্ষা, ইহা একটু কষ্টকর প্রতীয়মান হয় বলিয়া আমরা কি পরীক্ষাকে শত্রু মনে করিব, অথবা তাহার আপাততঃ অল্লাধিক কঠোর প্রণালী বিষবৎ জ্ঞান করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইব? যদি আমরা ঈশ্বর-বিশ্বাস ও নির্ভর প্রাণের মূল ধন করিতে পারি, এবং সেই মূলকে অবলম্বন করিয়া আমরা জীবনের কর্ত্তব্য করিতে থাকি, তাহাতে স্বাভাবিক প্রকরাণানুসারে পরীক্ষা যদি সমুপ-

স্থিত হয়, তাহা বিধাতার বিধান-প্রণালী-সম্ভূত মনে করিয়া তাহাতে যখন পরাঙ্মুখ না হই, তখন দেখিতে পাই যে, সে পরীক্ষা তিক্ত কটু মহৌষধির ন্যায় আমাদের অন্তরের অনেক বিকার বিনাশ পূর্ব্বক হৃদয়কে বিশুদ্ধ করিবার বিলক্ষণ সুযোগ প্রদান করে। বাল্যকালে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া যখন বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম, তথায়ও দেখিলাম, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার বিধি নিবদ্ধ আছে। সে পরীক্ষার জন্য যতই প্রস্তুত হইলাম, তাহার ফল আমাদের জীবনে ততই উপকার প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা আমরা জীবনে বিলক্ষণ অনুভব করি। পরীক্ষার ফল আশা মত না হইলে তদ্দ্বারা আমাদিগকে কত সতর্কতা শিক্ষা দেয়। পক্ষান্তরে তাহা যখন সন্তোষকর হয়, তখন তাহার সারত্বের অল্লাধিক আস্বাদন লাভ হওয়াতে সে জ্ঞান অধিকতর সারত্ব সহকারে যাহাতে মনে সঞ্চারিত হয়, তজ্জন্য উদ্যম কেমন সহজে প্রাণকে উৎসাহিত করে। যে শিক্ষার্থী পরীক্ষা কষ্টকর মনে করিয়া তাহাতে বিমুখ হয় অথবা তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে যত্ন করে না, সে জ্ঞান-সুধার সুমিষ্ট আস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া জীবন যে কেবল বিড়ম্বনাময় করে, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি। এখন এই ধরিয়া আমরা জীবনব্যাপী শিক্ষার বিধি ব্যবস্থা স্বীকার করি। তবে এ জীবন পরীক্ষা শূন্য হইলে কি আমাদের শিক্ষার পথ অবরুদ্ধ হইত না? অথবা তদ্দ্বারা আমাদের বিজ্ঞতা অভিজ্ঞতার পরিমাণ ও পরিচয় সহজে কি বুঝিতে পারিতাম? পরীক্ষা বস্তুর সারত্বের প্রতিপাদক—ইহা উন্নতির ক্রম-নির্দ্ধারক। তজ্জন্য পরীক্ষাকে

উপেক্ষা করিতে চেষ্টা কেবল কাপুরুষতার পরিচয় মাত্র। যে সৈনিক পুরুষ সমরে পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়, সে কি বীর বলিয়া কখন আদৃত হইয়াছে, ইতিহাস কি ইহার সাক্ষ্য কোন কালে দিয়াছে? ইহা উক্ত হইয়াছে, এবং ঘটনাদ্বারা ইহা এক প্রকার সাব্যস্ত হইতেছে যে, আমাদের এই বর্ত্তমান জীবন পরীক্ষার অবস্থা,—বিশ্রামের অবস্থা নহে; এবং যেখানে পরীক্ষা, সেখানে তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত আছে, ইহা কার্য্যকারণ-সূত্র-বদ্ধ-নিয়মের ন্যায় আমরা মনে করি। ইহা যখন নির্দ্ধারিত হইল, তখন সকল মনুষ্যের ইহা নিতান্ত কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা শান্তচিত্ত হইয়া সাবধানতা সহকারে সংসার রূপ কর্ম্মক্ষেত্রে পরীক্ষার জন্য সদা প্রস্তুত হইয়া শিক্ষালাভ করিতে থাকুন, তাহা হইলে জীবনে এই যে বিবিধ বিঘ্ন বিপদ, ইহারা বিরক্তির কারণ রূপে যেমন সাধারণতঃ অনেকের প্রাণকে বিষময় ও শান্তিহারা করে, তাহা না করিয়া প্রত্যুত একটী মানবাত্মাকে অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণখণ্ডের ন্যায় খাঁটি করিবে! সুতরাং অহঙ্কার-সংসারাসক্তিরূপ আবর্জ্জনা বিহীন আপন স্বরূপ লক্ষণ প্রত্যেক মানবাত্মা প্রকাশ করিয়া তাহা একটী একটী ব্রহ্মখণ্ড রূপে প্রজ্বলিত হইবে। বিদ্যার্থী পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে উপাধি ও জীবনোপায় পারিতোষিক স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। নিত্যজ্ঞান-পিপাসু শিক্ষার্থী ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের বিধান-নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া অমরত্বলাভে পরম চরিতার্থতা লাভ করেন। ঘটনা-তত্ত্ব ও ইতিহাস যেমন এক পক্ষের সাক্ষ্যদান করিতেছে, ভক্তদিগের জীবনও তেমনি অপর

উজ্জ্বল সাক্ষী-রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। যুগে যুগে দেশ-বিদেশের বিশ্বাসী ব্রহ্মসন্তানগণের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে ইহার সত্যতা সহজে সপ্রমাণিত হইবে। শ্রীঈশা, শ্রীচৈতন্য, ভক্ত-প্রবর ধ্রুব প্রহ্লাদ কত পরীক্ষা দিলেন! তাঁহারা পরীক্ষা কি উপেক্ষা করিতে বা এড়াইতে পারিতেন না? কিন্তু যে বিধাতা তাঁহাদের জীবনদাতা, এ সকল তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট বিধি জানিয়া তাঁহারা পরীক্ষাতে প্রাণ উৎসর্গ করিলেন, অলৌকিক রূপে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কেমন নিত্য পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন! জগতের কত কীর্ত্তিকলাপ বিলুপ্ত হইল, কিন্তু আজও তাঁহাদের সে অক্ষয় কীর্ত্তি সকল চারিদিকে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। এই সকল তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ইহা স্মরণ রাখা উচিত, যে আমরা অনন্তধামের যাত্রী; এ পৃথিবী কেবল মাত্র আমাদের শিক্ষাগার,—পান্থধাম; ইহা বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত হইয়া আমরা এখানকার সমস্ত প্রলোভন, পরীক্ষা, বিঘ্ন বাধা, বিপদ বিড়ম্বনা অতিক্রম করিতে সদাই প্রস্তুত থাকিব। সৈনিক পুরুষের ন্যায় যেন সদা সমর-সাজে সজ্জিত রহিব, এবং এই ভাবে জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করিয়া আমরা অনন্তধামে যাইব, কেননা তাহাই আমাদের গম্য-স্থান;—তাহাই জীবনের উদ্দেশ্য; এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ দ্বারা বিদেশের মায়া মোহ ছিন্ন করিয়া, স্বধামে—দিব্যধামে উপনীত হইব। তখন স্বদেশে গিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বলিব, "নাহি ভয়, হল ব্রহ্মের জয়"।

সাধন।

সাধনা বিনা কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। সামান্য হইতে বৃহৎ কার্য্য পর্য্যন্ত সকলই সাধন-সাপেক্ষ। পৃথিবীর যাহা কিছু প্রার্থনীয় তাহা অনিত্য—অস্থায়ী—অসার হইলেও তথাপি সাধন বিনা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকে অনেক সংশয়ের—অবিশ্বাসের—অজ্ঞানতার কথা বলিয়া থাকেন। অনেকে বলেন ধর্ম্ম দুর্ব্বোধ্য, পরকাল তত্ত্ব আয়ত্তাধীন নহে। কিন্তু আমরা বলি, উহা সাধনসাপেক্ষ নহে, ইহা কি কোন শাস্ত্রে উক্ত বা কোন সাধুমহাত্মা দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে, এমন কি কেহ বলিতে পারেন? সামান্য অর্থকরী—পৃথিবীর ব্যবহার্য্য বিদ্যা কি বিনা সাধনে কেহ উপার্জ্জন করিয়াছেন? অসার পার্থিব—যাহা পার্থিবসুখ-স্বচ্ছন্দতার কারণ তাহাও কি বিনা আয়াসে লব্ধ হইয়াছে? যদি এ সকল সামান্য রত্ন যত্ন বিনা লব্ধ হয় না, তখন নিত্যধন পরমধন ধর্ম্ম রত্ন যে বিনা সাধনে লব্ধ হইবে, ইহা মনে করা কি বাতুলতা নহে? আমরা প্রায় সমস্ত জীবন, বিষয় ব্যাপারে, বাহ্য কার্য্যে ব্যয় করি, ধর্ম্মসাধনের জন্য কই আমাদের ব্যাকুলতা, যত্ন ও চেষ্টা? যাঁহারা ধর্ম্মধনে ধনী হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনবেদ অধ্যয়ন করিলে দেখা যায় যে, সাধন বলে তাঁহারা অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন। অগ্রে যাহা অসম্ভব মনে করিতেন, তাহা সেই সাধন বলে সম্ভব জানিতে পারিলেন। অজ্ঞানী জ্ঞান লাভ করিয়াছে—নির্ধনী ধন প্রাপ্ত হইয়াছে, এবম্প্রকার সমস্ত ব্যাপার যে সাধন-সম্ভূত,

ইতিহাস, মানব-প্রকৃতি, সমুদয় ঘটনাবলি চিরকাল তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া আসিতেছে। বীজ বৃক্ষের উপাদান-কারণ, বীজের ভিতর বৃক্ষের ভবিষ্যদুন্নতির উপকরণ সন্নিবিষ্ট, কিন্তু সেই বীজকে যত্ন সহকারে যথা রীতি রোপণ বপন না করিলে, তাহাতে মৃত্তিকা ও জল সংলগ্ন না করিলে তাহা যেমন অঙ্কুরিত হয় না, অঙ্কুরিত হইলেও বর্দ্ধিত-বৃক্ষ প্রসব করে না এবং পরিণামে ফলফুল দান করে না, তদ্রূপ আমাদের মনের ধর্ম্মভাব সাধন-সাহায্য ব্যতীত কখন প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। উৎসবে যোগ দিলাম, কীর্ত্তনে মাতিলাম, আলোচনায় চৈতন্যলাভ করিলাম, তাহাতে ধর্ম্মভাবের একটু বিকাশ—উচ্ছ্বাস হইল, কিন্তু সেই ভাবাঙ্কুর হৃদয়-কন্দরে অবলম্বন-ভূমি না পাইয়া পরে নির্জীব—শুষ্ক হইয়া পড়িল। এই শুষ্কতা ক্রমে নিরাশা উৎপাদন করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে অবিশ্বাস ও সংশয় সমুপস্থিত করে, এবং এই কারণে, যে ব্যক্তি পূর্ব্বে একটু ধর্ম্মানুরাগ প্রকাশ করিত, তাহার বিষয়-বিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে সংশয়াত্ম করে। আজ কাল ঈদৃশ শোচনীয় ঘটনা অনেকের জীবনে আমরা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হই। বীজ জল-সংলগ্ন হইয়া যেমন অঙ্কুরিত হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রস্তুত ভূমিতে তাহা প্রতিষ্ঠিত না হইল, তাহা যেমন অকালে শুষ্ক ও ধ্বংস হয়, মানবের ধর্ম্মস্পৃহা সেইরূপ ঘটনাক্রমে একটু উদ্ভাবিত হইলে, সাধনবলে যদি সুরক্ষিত না হয়, তবে তাহা নিত্য সরস ও সতেজ ভাব ধারণ করিয়া তাহার আশা ও বিশ্বাসকে বর্দ্ধিত করিতে পারে না। বীজের ভিতর যেমন বৃক্ষ-রহস্য সন্নিবিষ্ট, সাধনের ভিতর মানব

জীবনের ধর্ম্ম-রহস্য তেমনি নিহিত। এই রহস্য ভেদ কর কত অপূর্ব্ব ভাবতত্ত্ব লাভ করিবে—বিধাতার লীলা-মাহাত্ম্য দেখিয়া কেমন পুলকিত ও চরিতার্থ হইবে। সেই জন্য আমর ধর্ম্ম বিষয়ে মুখভারতি অপেক্ষা তৎসম্বন্ধে সাধনের কার্য্য কারিতা, অধিকতর আদর করি;—পাণ্ডিত্য অপেক্ষা আত্ম তত্ত্বের গৌরব করি; ভজন ও সাধন উভয় একাধারে বিদ্য মান দেখিলে সুখী হই। যে গুণে আর্য্যসন্তান এত সম্মা- নিত, তাহার মূল কোথায় দেখ দেখি। দেখিবে যে, তাঁহার তপজপ সাধন-ভজনই, তাহার এক মাত্র কারণ। তিনি যেমন সুপণ্ডিত, তেমনি স[illegible]রী, সাত্ত্বিক ও নিষ্ঠাব্রতী। আমাদের চরিত্র, ব্যবহার ও জীব[illegible] সঙ্গে একবার তাঁহার আচার ব্যবহার জীবনী মিলাইতে য[illegible]ও, লজ্জা ও অনুতাপে অধোবদন হইতে হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে, সে আলো- চনা করা দূরে থাকুক আমরা অভিমানে স্ফীত হইয়া আমা- দের অধোগতির বিষয় একবারও চিন্তা [illegible]রি না। সাংসারিক অবনতি ও বৈষয়িক ক্ষতি হইলে, ত[illegible]র প্রতিকার করিবার পক্ষে কত যত্নবান হই, কিন্তু নিত্য-[illegible]তপাল্য ধর্ম্মব্রতে যে এত শিথিল হইয়া দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছি, ইহা একবার ভাবি না;— ভাবিয়া উপায়-বিধানে তৎপর হই না, ইহা অপেক্ষা অনিষ্টকর ঔদাসীন্য আর অধিক কি হইতে পারে? বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] পাঠাভ্যাসে যে এত উদাসীন, ইহা কই বল, একটু সন্নিবিষ্ট- চিত্তে আমরা অনুধাবন করিতে প্রবৃত্ত হই? ধন মান বিষয় বিভব অর্জ্জনে কতই ব্যস্ত; কিন্তু নিত্যধন চির

সম্বল যে কি,—তাহা ভাবিবার কি একটু অবকাশ নাই? উপস্থিত বিষয়ে ব্যস্ত হইয়া যে পরিণাম-দর্শনে উন্মনা হইল, তাহা অপেক্ষা অদূরদর্শী অর্ব্বাচীন আর কে হইতে পারে? অতএব মনুষ্য-পদবীধারণ করিয়া, নামের মর্য্যাদা যাহাতে আজীবন রক্ষা করিতে পারা যায়, তজ্জন্য সাধন করা যে আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, ইহা যেন আমরা আর না ভুলি। বৃথা বাকবিতণ্ডা করিয়া সময় নষ্ট করা অপেক্ষা সাধন শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য; কেননা সাধন-প্রভাবে যাহা দুর্ব্বোধ্য তাহা অনায়াস-বোধ্য হইবে, অন্ধকারে আলোক দেখিতে পাওয়া যাইবে, ভয় ভাবনা প্রভৃতি সব চলিয়া যাইবে, প্রাণে শান্তি আরাম আনন্দ উপভোগ হইবে। এ জীবন কেবল বিড়ম্বনা, এই বলিয়া সংসারের অবস্থার বিপাকে পড়িয়া যে তুমি এক এক বার আক্ষেপ করিয়া থাক, সে সমুদয় সঙ্কট হইতে চিরদিনের জন্য মুক্ত হইবে। সাধুসজ্জনদিগের কথা যাহা এখন কল্পনা মনে কর, তখন তাহা বুঝিতে পারিবে, এবং ধর্ম্ম ও পুণ্য উপার্জ্জন করিয়া প্রাণকে শীতল করিবে;—অতএব হে বন্ধু! এস আমরা ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হই,—সাধন অবলম্বন করি এবং অবশেষে জীবনে সিদ্ধিলাভ করিয়া কৃতার্থ হই। ভগবান সকল সাধকের যেমন মনোবাঞ্ছা যুগে যুগে পূর্ণ করিয়াছেন [illegible] পূর্ণ করিবেন। [illegible] আমরাও বিধাতার লীলা আমাদের সামান্য জীবনে উপলব্ধি করিয়া সফলকাম হই।

জীবনের ধর্ম্ম-রহস্য তেমনি নি[illegible]ত। এই রহস্য ভেদ কর কত অপূর্ব্ব ভাবতত্ত্ব লা[illegible]রবে—বিধাতার লীলা-মাহাত্ম্য দেখিয়া কেমন পুলকিত ও চরিতার্থ হইবে। সেই জন্য আমরা ধর্ম্ম বিষয়ে মুখভারতি অপেক্ষা তৎসম্বন্ধে সাধনের কার্য্যকারিতা, অধিকতর আদর করি;—পাণ্ডিত্য অপেক্ষা আত্মতত্ত্বের গৌরব করি; ভজন ও সাধন উভয় একাধারে বিদ্যমান দেখিলে সুখী হই। যে গুণে আর্য্যসন্তান এত সম্মানিত, তাহার মূল কোথায় দেখ দেখি। দেখিবে যে, তাঁহার তপজপ সাধন-ভজনই, তাহার এক মাত্র কারণ। তিনি যেমন সুপণ্ডিত, তেমনি সদাচারী, সাত্ত্বিক ও নিষ্ঠাব্রতী। আমাদের চরিত্র, ব্যবহার ও জীবনের সঙ্গে একবার তাঁহার আচার ব্যবহার জীবনী মিলাইতে যাও, লজ্জা ও অনুতাপে অধোবদন হইতে হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে, সে আলোচনা করা দূরে থাকুক আমরা অভিমানে স্ফীত হইয়া আমাদের অধোগতির বিষয় একবারও চিন্তা করি না। সাংসারিক অবনতি ও বৈষয়িক ক্ষতি হইলে, তাহার প্রতিকার করিবার পক্ষে কত যত্নবান হই, কিন্তু নিত্য-প্রতিপাল্য ধর্ম্মব্রতে যে এত শিথিল হইয়া দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছি, ইহা একবার ভাবি না;—ভাবিয়া উপায়-বিধানে তৎপর হই না, ইহা অপেক্ষা অনিষ্টকর ঔদাসীন্য আর অধিক কি হইতে পারে? বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য গুরু শিষ্য কত ব্যস্ত, কিন্তু বিশ্বাধিপের আদিষ্ট পাঠাভ্যাসে যে এত উদাসীন, ইহা কই বল, একটু সন্নিবিষ্টচিত্তে আমরা অনুধাবন করিতে প্রবৃত্ত হই? ধন মান বিষয় বিভব অর্জ্জনে কতই ব্যস্ত; কিন্তু নিত্যধন চির

সম্বল যে কি,—তাহা ভাবিবার কি একটু অবকাশ নাই? উপস্থিত বিষয়ে ব্যস্ত হইয়া যে পরিণাম-দর্শনে উন্মনা হইল, তাহা অপেক্ষা অদূরদর্শী অর্ব্বাচীন আর কে হইতে পারে? অতএব মনুষ্য-পদবীধারণ করিয়া, নামের মর্য্যাদা যাহাতে আজীবন রক্ষা করিতে পারা যায়, তজ্জন্য সাধন করা যে আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, ইহা যেন আমরা আর না ভুলি। বৃথা বাকবিতণ্ডা করিয়া সময় নষ্ট করা অপেক্ষা সাধন শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য; কেননা সাধন-প্রভাবে যাহা দুর্ব্বোধ্য তাহা অনায়াস-বোধ্য হইবে, অন্ধকারে আলোক দেখিতে পাওয়া যাইবে, ভয় ভাবনা প্রভৃতি সব চলিয়া যাইবে, প্রাণে শান্তি আরাম আনন্দ উপভোগ হইবে। এ জীবন কেবল বিড়ম্বনা, এই বলিয়া সংসারের অবস্থার বিপাকে পড়িয়া যে তুমি এক এক বার আক্ষেপ করিয়া থাক, সে সমুদয় সঙ্কট হইতে চিরদিনের জন্য মুক্ত হইবে। [illegible] কথা যাহা এখন কল্পনা মনে কর, তখন তাহা বুঝিতে পারিবে, এবং ধর্ম্ম ও পুণ্য উপার্জ্জন করিয়া প্রাণকে শীতল করিবে;—অতএব হে বন্ধু! এস আমরা ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হই,—সাধন অবলম্বন করি এবং অবশেষে জীবনে সিদ্ধিলাভ করিয়া কৃতার্থ হই। ভগবান সকল সাধকের যেমন মনোবাঞ্ছা যুগে যুগে পূর্ণ করিয়াছেন আমাদেরও মনোরথ পূর্ণ করিবেন। অতএব এস তদ্রূপ আমরাও বিধাতার লীলা আমাদের সামান্য জীবনে উপলব্ধি করিয়া সফলকাম হই।

জ্ঞান ও বিশ্বাস।

আজ কাল জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজ্য যে দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে, ইহাতে কাহারও সন্দেহ নাই বলিয়া আমাদের বোধ হয়। পূর্ব্বকালে বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে যে সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের কুটিল সমস্যার মীমাংসা করা দুরূহ বলিয়া প্রতীয়মান হইত, আজ কাল সামান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রকে সে মীমাংসায় বিলক্ষণ দক্ষ দেখা যায়। জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজ্য বিস্তৃত হইতেছে, ইহা প্রকৃত কথা; কিন্তু তথাপি কেন এত অভাব—অসদ্ভাব মনুষ্যের প্রাণকে অস্থির করে? রাজ্য বিস্তৃত হইলেই কি [illegible] ঐশ্বর্য্য ও কল্যাণ? রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের শান্তি স্থাপন নিতান্ত প্রয়োজন। প্রশস্ত নদীর বিস্তৃতির সঙ্গে যদি গভীরতা না থাকে, তবে তাহা গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে শুষ্ক হয়। আমাদের সমাজে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তার হইয়াছে ইহা স্বীকার করিলেও একটী বিশেষ অভাব প্রযুক্ত অনেক দুর্ঘটনা ও বিড়ম্বনা ঘটিতেছে। এই যে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তৃতি, ইহা আড়ম্বরপূর্ণ—অসার, কেননা আসল বস্তু, যাহা সমুদয় প্রাণকে সমুজ্জ্বল করিবে; তাহারই অভাব দৃষ্টিগোচর হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিদ্যালাভ হইতেছে, তাহা অনেক পরিমাণে অবিদ্যা বলিয়া উক্ত হইবার উপযুক্ত; কেননা সে বিদ্যা মনের অন্ধকার দূর করিয়া অন্তরকে উজ্জ্বল করে না; যে জ্ঞান আত্মজ্যোতি বিকাশের সহায় হয় না, তাহা ত অবিদ্যা—অপরা জ্ঞান। উল্লিখিত জ্ঞান আমাদিগকে বাহ্য সভ্যতা

যেমন শিক্ষা দিয়াছে,—কিন্তু আত্মদৃষ্টি কৈ তাদৃশ উজ্জ্বল করিয়াছে? শুধু ভাল ক্ষেত্র—ভাল বৃষ্টি হইলে শস্য লাভের আশা করা যায় না, ভাল পরিপক্ক বীজের প্রয়োজন। এই তিনের সংযোগে ভাল ফসল লাভ হয়। আমাদের এক্ষণে বিশেষ অভাব এই যে, জ্ঞান বিজ্ঞানের আতিশয্য সত্বেও এক বিশ্বাসের অভাব প্রযুক্ত এত অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে। যে হৃদয়-ভূমি জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে, যাহা হইতে কুসংস্কারের কণ্টক-রাশি বিদূরিত হইয়াছে, কিন্তু বিশ্বাসরূপ সুন্দর বীজের অভাবে তাহাতে সে আশ্বাসিত ফল লব্ধ হই-তেছে না, যাহা মানব-জীবনের সমস্ত দুঃখ—সকল সন্তাপ দূর করিবার প্রশস্ত উপায় স্বরূপ হইবে। এই বিশ্বাসের অভাব প্রযুক্ত আমাদের প্রাণ সদাই সন্দেহপূর্ণ—সদাই চঞ্চল। কেননা আমরা বিদ্যালয়ে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি ও করি-তেছি, তাহা কেবল আমাদিগকে বাহ্য-বস্তুর সহিত মানব প্রকৃ-তির সম্বন্ধ নিরূপণ করিবার শক্তি উদ্ভাবন করিবার সহায়তা করিয়া দিতেছে; কিন্তু তাহা অন্তর্জগতের বিষয় সম্বন্ধে তাদৃশ সহায়তা প্রদান করে না। ইহা আমাদের বাহ্য দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করিয়াছে, অন্তরের দুরবস্থা যেমন প্রায় তেমনই রহিয়াছে। অন্ধের পক্ষে বাহ্য-জগৎ যেমন শূন্য,—সৌন্দর্য্য-বিহীন, অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে আমরা সেই রূপ অন্ধ। চক্ষু যেমন বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে, বিশ্বাস তদ্রূপ অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে। আমরা বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করিয়া কত কার্য্য সম্পন্ন করি, কিন্তু ভগব-দ্ভক্তি সম্বন্ধীয় অতি সামান্য তত্ত্ব বুঝিতে বা সাধন করিতে অক্ষম হই। বিশ্বাস চক্ষু না থাকাতে আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান

বাহ্য বস্তু সম্বন্ধীয় কার্য্য ব্যতীত আধ্যাত্মিক রাজ্যের কিছু দেখিতে পায় না। সুতরাং আত্মার লীলা-রাজি দেখিয়া যে অপার আনন্দ সম্ভোগ করা যায়, তাহাতে আমরা বঞ্চিত। স্থিরভাবে দৃঢ়তার সহিত কোন হিতকর কার্য্যে আমরা তাদৃশ তৎপর হই না, মূল হারা হইয়া আমরা আশ্রয়-কূল অনুসন্ধান করিতে অক্ষম, নানা ভুল ভ্রান্তিতে আমরা ম্রিয়মাণ। জ্ঞান প্রভাবে আমরা রাজকার্য্য আলোচনা করি, রাজ্যভার আমরা বহন করি, কিন্তু যে রাজরাজ্যেশ্বরের রাজ্যে বাস করি, যে অন্নদাতা দেবতার প্রসাদান্নে আমরা প্রাণধারণ করি, যাহা হইতে এই প্রাণ মন সর্ব্বস্ব পাইয়াছি—তাঁহাকে স্মরণ করিবার বা তাঁহার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবারও অবকাশ পাই না; তিনি আমাদের সহায় সম্বল, অথচ তাঁহার উপর নির্ভর করিতে রুচি হয় না। এই জ্ঞান বিজ্ঞান যদি সে ভাব উজ্জ্বল করিয়া না দিল,—সে বিশ্বাসের সহায় না হইল, তবে তাহাদিগকে কি আত্মঘাতিক শত্রু ইহা মনে করিলে প্রত্যবায় হয়? কিন্তু আজ কালের যুবকবৃন্দের ব্যবহার বা জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে ইহা ভিন্ন আর অন্য কোন সুদৃশ্য আশাপ্রদ ছবি দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাণ-বিহীন বিকট দেহ যেমন অসার ও কদর্য্য, বিশ্বাস-বিহীন জ্ঞান-বিজ্ঞান-যুক্ত অভিমানী মন ঠিক তদ্রূপ। বর্ত্তমান সময়ে বাহ্য সভ্যতার আড়ম্বর—বাহ্য জ্ঞানের শোভার জন্য আমাদের মন এত লোলুপ,—এত ব্যস্ত যে, হৃদয়-নিহিত বিশ্বাসখনি-সমুদ্ভূত অমূল্য রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া যে, আমরা নিত্য ধনে ধনী হইব, এরূপ ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া

পড়িয়াছে। যত দিন না এ জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসের সাধন প্রবল হইতেছে, তত দিন আমাদের ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কল্যাণ সংসাধিত হওয়া অসম্ভব। এজন্য ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য যে, আমরা যে জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস সাধন পূর্ব্বক জীবনের সমগ্র উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া কৃতার্থ হই।

প্রেম ও সেবা।

মাধ্যাকর্ষণ ও যোগাকর্ষণ যেমন বাহ্য জগতের সুশৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতেছে, তদ্রূপ প্রেম ও সেবা আধ্যাত্মিক জগতের শান্তি ও কুশল সংরক্ষা করিয়া থাকে। বিচিত্র-কর্ম্মা ভগবান বিচিত্র কৌশল-যোগে তাঁহার বিস্তৃত বিশ্বযন্ত্র পরিচালন করিতেছেন। মানবাত্মাও তাঁহার এই অপূর্ব্ব কৌশলান্তর্গত। প্রেম ও সেবা এ দুই আকর্ষণ স্বরূপ হইয়া মানবাত্মাকে মঙ্গলের দিকে লইয়া যাইতেছে। আকাশ হইতে বারি-ধারা কর্ষিত ভূম্যুপরি পতিত হইয়া যেমন শস্য উৎপাদন করে, ঈশ্বরের প্রেমবারি সেইরূপ জীবসেবোন্মুখ প্রাণে সঞ্চারিত হইলে নরনারীকে মোক্ষ ফলের অধিকারী করে। স্বার্থপর মানব-হৃদয় প্রেম ও সেবার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহে। সংকীর্ণ স্থান যেমন শরীরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অন্তরায়, স্বার্থের গণ্ডী তদ্রূপ মনের উন্নতির পক্ষে বিঘ্নময়। স্বার্থপর মনুষ্য আপনার ভিন্ন আর কিছু জানে না। আপনার সংসার রূপ ক্ষুদ্র প্রাচীরের বাহিরে কি হইতেছে সে ভাবে না। কিসে তার অথবা তার নিজ পরি-

বারের ভাল হয়, সংকীর্ণ-মনা স্বার্থপর ব্যক্তির কেবল তাই একমাত্র ভাবনা ও কামনা ; এবং ইহারই জন্য সে সদা ব্যস্ত। এতাদৃশ সঙ্কুচিত ও ভয়ানক অবস্থাপন্ন যাহারা, তাহারা প্রশস্ত প্রেম-রাজ্যের—স্বর্গধামের সুখের সংবাদ কিরূপে পাইবে—কি প্রকারে বুঝিতে সমর্থ হইবে। প্রেম ও সেবা এই দুইটী আকর্ষণ মানবাত্মাকে উন্নতির দিকে টানিয়া লয়। যত এই দুটি আকর্ষণে আমরা আকৃষ্ট হইব, ততই সংকীর্ণতার সীমা অতিক্রম করিয়া—স্বার্থের গণ্ডী ভেদ করিয়া স্বর্গরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইব। এই দুইটী আকর্ষণের শক্তি ও গুণ এই যে, তাহারা আপনাকে ভুলিয়া যাইতে শিক্ষা দেয়, এবং পরের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত করে। মনের বেগ নিবারণ করা সহজ নহে, মন মনন করিবেই করিবে। অতএব এই মনকে আপনার জন্য চিন্তা করিতে না দিয়া পরের হিত চিন্তায় নিযুক্ত করাই প্রশস্ত ও শ্রেয়ঃ। "স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং, প্রীতিঃ পরমসাধনম্," ইহা মহাবাক্য। স্রোতস্বতীর বেগ যেমন উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া উত্তরোত্তর প্রশস্ত-বক্ষ ধারণ করিয়া তাহাকে সাগর-সঙ্গমে আনীত করে, প্রাণের ভালবাসার বেগ সেইরূপ নিজ প্রাণ ভেদ করিয়া আত্মীয়-বর্গকে আলিঙ্গন করে, আত্মীয়বর্গকে অতিক্রম করিয়া পল্লীতে বিস্তৃত হয়, এবং ক্রমশঃ সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হয়। কর্ত্তব্য-জ্ঞান হইতে ভালবাসার সঞ্চার হয়, পরি-শেষে ঈশ্বর-কৃপায় প্রেম-সাগরে তাহা নিপতিত হইয়া প্রশস্তাকার ধারণ করে। এজন্য উচিত বলিয়া সেবা করা সেবার সূচনা মাত্র, কিন্তু ভালবাসা হইতে যে সেবা

স্পন্ন হয় তাহাই প্রশস্ত। এ উভয় ভালবাসার বিলক্ষণ তারতম্য দেখা যায়। একটী সামগ্রী, কিন্তু ইহার নিয়োগ প্রয়োগে ফলের অনেক তারতম্য হয়। স্বার্থপর হইয়া ভালবাসা আপনাতে প্রয়োগ কর, তুমি নরকের দিকে—মরণের পথে, যাইবার যোগাড় করিবে; কিন্তু পরকে ভালবাসিতে শিক্ষা কর—সাধন কর, তদ্দ্বারা তুমি অমর হইবে, স্বর্গসুখের অধিকারী হইবে, কেননা আপনাকে ভালবাসার নাম নরক ও অপরকে ভালবাসাই স্বর্গ। এই প্রেমের বেগ ঈশ্বর হইতে নিয়তই আসিতেছে, মনুষ্য স্বার্থের বাঁধ দ্বারা সে বেগ অন্তরে প্রবেশ করিতে দেয় না বলিয়া এত কষ্ট ভোগ করে, নতুবা সে বেগ তাহাকে প্রেমসাগরে উপনীত করিয়া তাহার কত সুখ বৃদ্ধি করে!

পরসেবা আর একটী আকর্ষণ। আমরা নানা পাপকলঙ্কে কলঙ্কিত। আমাদের মন নানা কারণে অসাড় ও জঘন্য, কিন্তু পরসেবা রূপ পুণ্যজলে আমাদের পাপ-মলিনতা দূর হইবে, ইহা বিশ্বাস করিয়া আমরা যত পরসেবা করিব, তাহাতে যে কেবল ইহকালে আমাদের জীবন কৃতার্থ হইবে এমত নহে, কিন্তু তাহা আমাদের চির সম্বল হইয়া পরকালের সহায় হইবে। কিন্তু আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে, যেন পরসেবা অহঙ্কারের কারণ না হয়। কেননা অহঙ্কার-সম্ভূত পরসেবায় পুণ্য-সঞ্চয় হওয়া দূরে থাকুক, তাহাতে আরো পাপ অপরাধ বৃদ্ধি করে। ঘর্ষণ যেমন ধাতুকে মার্জ্জিত করে,—স্বর্ণ যেমন অগ্নিদগ্ধ হইয়া উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে, পরসেবা তদ্রূপ আমাদের অহঙ্কার ও অভিমানকে সংযত এবং পাপ-জঞ্জাল

বিদূরিত করিয়া আত্মাকে শুদ্ধ করে। অতএব পরসেবা পরম সাধন—মোক্ষলাভের উৎকৃষ্ট সোপান। গর্ব্বিত ভাবে পরসেবা যেমন দূষণীয়, বিরক্ত-প্রাণ অথবা বিকার-ভাবাপন্ন হইয়া পরসেবা তদ্রূপ অসার ও বিড়ম্বনার কারণ। সমুদয় বিষয়ের যথাযথ নিয়োগের উপর ফলাফল নির্ভর করে। বিচিত্র-লীলাময় বিশ্বপতি মনুষ্যের উদ্ধার ও কল্যাণের জন্য বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাকে স্থাপন করিয়াছেন, এবং এমন আশ্চর্য্য প্রেম-বন্ধনে তাহাকে বাঁধিয়াছেন যে, যদি সে তাঁহার মহদভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য্য করে, নিশ্চয় সে মহৎ ফল লাভ করিবে। কিন্তু মোহ প্রযুক্ত সে সময়ে সময়ে এত আত্মহারা হইয়া পড়ে যে, সেবার নিগড় বন্ধন অতিক্রম করিতে অক্ষম হইয়া কার্য্য করে বটে, কিন্তু বিকার-বিহীন হইয়া সে কার্য্যটী করিলে সে যে পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিত, বিরক্ত-প্রাণ হইয়া কার্য্যটী করিয়া সে পুণ্যফল হারাইয়া ফেলে। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক চাকরি দ্বারা পরিবার পালন করিয়া থাকেন, কিন্তু মোহ ও কুঅভ্যাস বশতঃ এই যে ধনাগমের উপায় ইহা ক "চাকুরি কি ঝক্‌মারি" এই সাংঘাতিক উক্তি দ্বারা আমরা আমাদের মনের বিরক্তি প্রকাশ করি। যখন বিধাতার কৌশল-শৃঙ্খল ছিন্ন করা দুরূহ দেখিতেছি, তখন ইহার গূঢ় ভাব অনুধাবন করিয়া সেবার ভাবে ইহা গ্রহণ ও পালন করিলে, ইহা হইতেই আবার মিষ্ট রস ক্ষরিত হইয়া আমাদের বিবিধ সম্বন্ধযোগকে যে সরস করে, তাহা আমরা স্থির-চিত্ত হইয়া যখন দেখি, তখন দেখিতে পাই যে, আমাদের ইহজীবনের সমস্ত

কার্য্যযন্ত্র ইহাদ্বারা পরিচালিত হইতেছে। অতএব প্রেম ও পরসেবা সামান্য মনে করা উচিত নহে। এই সাধন দ্বারা স্বর্গলাভ হয়। পরকে ভাল বাসিলে বুঝিতে পারি, পরসেবায় জীবন উৎসর্গ করিলে স্বার্থসাধন রূপ গরল হইতে অমৃত উদ্ভাবিত হয়। স্বার্থপরতা রূপ নরককুণ্ড হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষধামে যাইবার মনুষ্যের পক্ষে প্রেম ও সেবা এই দুই আকর্ষণ সম্বল স্বরূপ। ঈশ্বর-কৃপায় এই আকর্ষণ তাহাকে স্বর্গরাজ্যে উপনীত করিবে।

বল।

বল আশা ভরসার কারণ—বলই সম্বল। বিশ্বপতি বিশ্বস্রষ্টা এই বলকে মন্ত্রপূত করিয়া সৃষ্টির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; তাই এই বিশ্বযন্ত্র এমন সহজে সুন্দরভাবে চলিতেছে। মাধ্যাকর্ষণ [illegible] [illegible]ব, সমুদয় বস্তুকে যেন লৌহনিগড়ে বাঁধিয়া সৃষ্টির শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে। এই বলের অভাব যদি জড়েতে, জীবের ভিতরে, প্রাণীর প্রকৃতিতে বিদ্যমান না থাকিত, তবে কেহ কি স্ব স্ব কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া জগৎ-কর্ত্তার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিতে পারিত? একভাবে দেখিলে ইহা প্রতীত হয় যে, বল আবার জীবনের কারণ—প্রাণের অবলম্বন। কেননা জড়জগতই দেখ, আর প্রাণি-জগতই দেখ না কেন, যেখানে বলের অভাব বা অসদ্ভাব, তাহাই মৃত হয়, বা মৃতবৎ হইয়া পড়ে। বলপ্রভাবে বৃক্ষ উন্নত

হয়—বৃদ্ধিলাভ করে এবং ঐ বলই জীবজন্তুর জীবনের পরিচয় দেয়। ফলকথা এই যে, এই বিশ্ব কেবল বলের ব্যাপার—শক্তির কারখানা। যত কল কৌশল, কেবল এই বলের যোগ সংযোগ—বলের মেলা—বলের খেলা—বল ছাড়া কিছু নাই—কিছু হইতে পারে না। মনুষ্য জীবনেও সমস্তই বলের ব্যাপার। বল-হীন দুর্ব্বল মনুষ্যের আশা ভরসা কোথায়? তার অবলম্বনই বা কই? যে বলহীন সে অতি কৃপাপাত্র—দীন। বাস্তবিক বিবিধ উপায়ে যখন সে বল সংগ্রহ করে—শক্তিশালী হয়, তখনই তাহার জীবন সফল হয়;—সৌভাগ্য লাভের আশা তাহার প্রাণে সঞ্চারিত হয়; নতুবা কেবা তাহাকে জানে—কেবা মানে? এই বল-শক্তির পরাক্রম যে পরিমাণে তাহার প্রকৃতিতে বিকশিত—সঞ্চিত হয়, সেই পরিমাণে সে খ্যাতিলাভ করে,—প্রতিপত্তিশালী হয়। ফলতঃ এই বলের শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট অঙ্কুর মঙ্গলময় বিধাতা তাহার স্বভাবে অঙ্কুরিত করিয়া দিয়াছেন বলিয়া, সে সৃষ্টির শিরোমণি—সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইল। সংকল্প রূপ সূক্ষ্ম উপকরণ (যদি উপকরণ নামে ইহা বাচ্য হইতে পারে) হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি। বিধাতা পুরুষ সংকল্প করিলেন, সেই নিগূঢ় সংকল্প হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল। মনুষ্যই কেবল এই সন্ধান জানিবার অধিকার লাভ করিল। এই সন্ধান জ্ঞানই তাহার মহত্ত্বের কারণ। অন্য পদার্থ বা প্রাণী সেই একই সূত্র হইতে সমুদ্ভূত হইল বটে, কিন্তু এই সন্ধান-জ্ঞান-অভাবে তাহাদের অবস্থাভেদ হইল। বলের যোজনা সংযোজনা

সকলেতে থাকা সত্ত্বেও মনুষ্য কেবল এক উৎকৃষ্ট জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতি বল-প্রসাদে এত গৌরবান্বিত হইল।

আমরা বলের মাহাত্ম্যের বিষয় আলোচনা করিলাম। এক্ষণে এই বলের প্রভাব ও বিকাশ বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে এই বলের অধিকারী বলিয়া মানুষের এত গৌরব; এবং এই অধিকারের সদ্ব্যবহারই সেই গৌবরের বিকাশ,—নতুবা প্রদত্ত গৌরবের অবসান হয়। পদপ্রাপ্ত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু পদ রক্ষা করা অল্লাধিক কঠিন। তাই অনেক সময়ে দেখা যায় যে, এই অধিকারের ব্যবহারের তারতম্য প্রযুক্ত মনুষ্যের অবস্থার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। মানুষ যে পরিমাণে যাদৃশ বল লাভ করে, সেই পরিমাণে তাহাতে তাদৃশ আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। যে ধন সংগ্রহ বা প্রাপ্তি দ্বারা মনুষ্যের ধন-বল লাভ হয়, সেই ধন-বলে কত লোককে সে আপনার অধীন করে। এই রূপে ধন-বল তাহার অন্যবিধ বলের সহায়তা করে, অর্থাৎ ধনের দ্বারা সে লোকবল জ্ঞানবল প্রভৃতি সহজে লাভ করিতে পারে; এবং লাভ করিয়া তাহার অধিপত্য বিস্তার করিতে; সমর্থ হয়। এই রূপে অন্যবিধ বলের প্রসাদে বল পরম্পরাকে একধারে স্থাপিত হইয়া তাহার অধিকার বিস্তৃত করিয়া থাকে। জ্ঞানবলে ধন সংগ্রহ, ধনবলে লোক সংগ্রহ, লোক-বলে আধিপত্য বিস্তার হওয়া বিলক্ষণ সম্ভবপর, ইহা সহজে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু বস্তু বা বিষয় মাত্রই কোন না কোন গূঢ় বা মৌলিক কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা সাধারণ নিয়ম এবং

কতকগুলি আনুষঙ্গিক উপকরণ তাহার পরিপোষক রূপে স্থিতি করে। মনুষ্যের এই সমুদয় বলেরও একটী মূল আছে। ধন, মান, জ্ঞান, বুদ্ধি এসকল সেই মূলকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি বা উন্নতি লাভ করে, সুতরাং যতক্ষণ সেই মূলকারণ নির্দ্ধারিত ও সেই গূঢ়শক্তি বিকশিত না হয়, তত দিন এসকল বল সম্বল কেবল আড়ম্বর মাত্র। জ্ঞান, ধন, বুদ্ধি, বিদ্যা বা লোকবল, যদ্দ্বারা মনুষ্য কর্ম্মক্ষেত্রে সহায়তা লাভ করিয়া কার্য্য সচ্ছলতা সহকারে সম্পাদন করে অথবা প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া থাকে, সে সমুদয়ের সফলতা বা কার্য্যকারিতার কারণ তাহার স্বভাব বা চরিত্র যদি সদ্‌গুণসম্পন্ন বা সদুপকরণে গঠিত হয়, তবেই তাহা হইতে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা ; নতুবা যেমন কোন ফুলের শোভা আছে অথচ গন্ধ নাই, তেমনি চরিত্র-বিহীন মনুষ্যের কার্য্যের বিলক্ষণ আড়ম্বর —খুব ধুমধাম সত্ত্বেও তাহার সারত্ব—স্থায়ীত্ব কোথায়? আমরা বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিই, ধন উপার্জ্জন করি, লোকবল লাভ করি, অথবা বিবিধ কার্য্য করি, যাই কেন করি না, চরিত্রবান না হইলে সকলই অসার, সব কাজ পণ্ড ও আড়ম্বরপূর্ণ। ছিন্ন-পল্লব দ্বারা গৃহ যতই কেন সুসজ্জিত কর না, তাহা যেমন ক্ষণকালমাত্র শোভা প্রকাশ করিয়া শুষ্ক হইয়া যায়, চরিত্রহীন মনুষ্য যতই যাগ যজ্ঞ করুক না কেন, সে সমস্ত ভস্মে আহুতি সদৃশ নিষ্ফল হয় ; তাহা দেবতার গ্রহণ-যোগ্য হয় না। সুতরাং তাহা সাধারণ লোক-রঞ্জনকর হইলেও ভক্তমনোরঞ্জনকর হয় না, সুতরাং ভক্তবৎসল শ্রীহরির তাহা মনঃপুত নহে।

কিন্তু এই যে চরিত্র-বলের কথা বলা হইল, এ চরিত্র কি? ইহা কোন্ উপাদানে গঠিত? ইহার মূল কোথায়? যেমন সারবান সৎকার্য্য সচ্চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তেমনি ধর্ম্মকে অবলম্বন না করিলে আবার চরিত্র গঠিত, উন্নত ও সংরক্ষিত হইতে পারে না। এই ধর্ম্ম আবার ধর্ম্মাবহ সত্য-স্বরূপ আদি মহান্‌পুরুষ পরমেশ্বরেতে নিহিত। এখন দেখা যাউক, আমরা যে মনুষ্য বলিয়া এত অহঙ্কার, অভিমান করি, এত গৌরবান্বিত মনে করি, এ সকলের কারণ কোথায়? আমাদের বল বিক্রম কোথা হইতে আইসে? স্থিরভাবে শান্তমনে দিব্যজ্ঞান প্রভাবে চিন্তা করিলে বিলক্ষণ প্রতীত হইবে যে, আমাদের সমুদয়, যাহা কিছু বল—নিত্য সম্বল, সকলের কারণ সেই সনাতন সর্ব্বশক্তিমান মহান ঈশ্বর। তাঁহাতে আমরা অনুপ্রাণিত হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ না হইলে—ধর্ম্মসাধন না করিলে চরিত্রবান্ হইতে পারি না; এবং চরিত্রবান না হইলে, সব কর্ম্মকাণ্ড—অসারের অসার; তাহা হইতে নিত্য সম্বল লাভ নিতান্ত অসম্ভবপর। তাই আমরা বলি, যতই বললাভ কর না কেন, চরিত্রবল ধর্ম্মবল বিহনে, সকলই অকিঞ্চিৎকর। হে ভারতসন্তান! যদি স্বীয় জাতীর গৌরব স্মরণ কর, যদি আর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া শ্লাঘা করিতে চাও, দেখিবে—তৎসম্বন্ধীয় যত কিছু মহত্ত্ব—যাহা কিছু গৌরব সকলি চরিত্র ও ধর্ম্মবলসম্ভূত। আমরা বিদ্যার মহিমা, জ্ঞানের গৌরব, ধনের প্রভাব, বলবিক্রমের প্রতাপ যা কিছু দেখাই না কেন, যত কিছুরই পরিচয় নানা মতে দিই না কেন, যতদিন চরিত্রের বিশুদ্ধতাসম্ভূত গৌরব,

ধর্ম্ম-সাধন-সিদ্ধ মহিমা, জীবনে দেখাইতে অক্ষম থাকিব, ততদিন আমরা যে প্রকৃত দুর্ব্বল, কৃপাপাত্র দীন,—ইহা জান উচিত। এখন অসার অহঙ্কার ছাড়, নিজ নিজ অবস্থা চিন্তা কর, বাহ্য পাণ্ডিত্যাভিমানের পরিচয়ের আর আবশ্যক নাই; কিন্তু কেমন যে ঘৃণিত—কত যে পতিত—কিরূপে যে দলিত হইয়াছি বা হইতেছি, ইহা চিন্তা কর; চিন্তা করিয়া যাহাতে এ দুরবস্থা দূর হয়, তাহার সদুপায় নির্দ্ধারণ কর;—তাহা জীবনে পালন ও অবলম্বন কর। এক সময় বড় ছিলে বলিয়া আর শ্লাঘা করিলে চলিবে না, কিন্তু হৃত-মহত্ব আবার পাইবার জন্য এস আমরা একান্ত যত্নবান হই। বল, সম্বলের আকর যে সেই সর্ব্বশক্তিমান; তাঁহার শরণাপন্ন হই; তাঁর নিকট শক্তি ভিক্ষা করি; কেননা সেই শক্তিবলে যুগে যুগে পাপী তাপী, সাধু অসাধু, ঋষি মুনি সকলই মুক্তিলাভ করিয়াছেন। আমরাও তাঁহারই প্রসাদে সদ্গতি লাভ করিব। বল সম্বল লাভ করিয়া "কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি" এই মহাবাক্যের সদ্ভাব অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইব।

কৃতজ্ঞতা।

কৃতজ্ঞতা মনুষ্যের একটী বিশেষ গুণ। এই গুণটী মনুষ্য-জীবনে যত বিকশিত হয়, ততই ফুল্লকুসুম সদৃশ সুন্দর ভাব ও শোভা ধারণ করে, এবং তাহার সৌরভে মানবের প্রাণোদ্যান ও সমাজমণ্ডলকে আমোদিত করে। কৃতজ্ঞ-হৃদয় নিয়তই সরস। যেমন আর্দ্রভূমি বিন্দু জল সংস্পর্শে

অধিকতর আর্দ্র হইয়া কোমল হইতে কোমলতর অবস্থায় পরিণত হয়, কৃতজ্ঞ ব্যক্তি তদ্রূপ সামান্য উপকার প্রাপ্ত হইলে, বিনয়াবনত—বিগলিত ভাবের পরিচয় দেয়; এবং প্রাপ্ত উপকার যথারীতি স্বীকার পূর্ব্বক আপনাকে ধন্য মনে করে, ও প্রদাতার প্রসন্নতা বর্দ্ধন করে। কিন্তু কেমন বিপরীত সেই প্রাণ, যাহা কৃতজ্ঞতা-রসাভিষিক্ত নহে! মরুভূমি যেমন বারিধারা শোষণ করে, ও ভূগর্ভ নিহিত জলরাশিদ্বারাও আর্দ্র-বক্ষঃ হয় না,—নিয়তই নিরস, শস্যাদি প্রসব করে না, কৃতজ্ঞতা-বিহীন জীবন তদ্রূপ। মরুভূমি সদৃশ কৃতঘ্ন প্রাণ কচিৎ কোন উপকার প্রদান করে, বা প্রাপ্ত উপকার স্বীকার করে। উভয়ই শুষ্ক—নিরস; সুতরাং কোন সুফল তাহাদের নিকট প্রত্যাশা করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। কৃতঘ্নের জীবন নরাধমের জীবনের মত একান্ত পরিহার্য্য।

কৃতজ্ঞতা কথাটী সামান্য; কিন্তু কার্য্যটি অতি গুরুতর। ইহা মনুষ্যের কর্ত্তব্যের আদি অক্ষর, মূলমন্ত্র। উর্ব্বরা ভূমিতে রোপিত একটী বীজ যেমন সহস্র শস্য প্রদান করে, কৃতজ্ঞহৃদয়ে তদ্রূপ ভাবাঙ্কুর সহজে অঙ্কুরিত হইয়া, কতই তত্ত্বজ্ঞান প্রসব করে। উপকারীর উপকার স্বীকার করা,—বন্ধুদিগকে তাঁহাদের প্রদত্ত সহায়তার জন্য সম্মান দেওয়া,—পিতামাতার অপরিশোধ্য ঋণভার জন্য কৃতদাসের ন্যায় তাঁহাদের পদানত থাকা, আত্মীয় স্বজনবর্গের আত্মীয়তাকে স্মরণ করা, এবম্বিধ কর্ত্তব্য-ভার অবনত মস্তকে বহন করা কি সহজ ব্যাপার? কত সরস সে প্রাণ, যে এ গুরুভার সহজে বহন করিতে সমর্থ! কেবল সরস—সজীব বৃক্ষশাখা যেমন

ফল প্রসব করে, ও ফলভার বহন করিতে সমর্থ হয়; শুষ্ক শাখা যেমন তাদৃশ নহে, কৃতজ্ঞ রসাভিষিক্ত প্রাণই তদ্রূপ কর্ত্তব্যভার বহনের একমাত্র উপযুক্ত। এই মহদ্‌গুণের উৎস, হৃদয়-কন্দর হইতে বিনিঃসৃত হইয়া ভাবলহরী সহকারে যথন কর্ম্মভূমিতে পরিব্যাপ্ত হয়, সে দৃশ্য কেমন স্বর্গোপম মনোহর, —কেমন চমৎকার! বাস্তবিক যে ব্যক্তি কর্ত্তব্যের ধার ধারে না, দায়িত্বের মহত্ত্ব বুঝে না, এসকল গুরুতর বিষয় যে মানে না—অবমাননা করে, সে পশুসম নরাধমের জীবন যে অসার, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। অথচ এমন সরল—সরস হৃদয়বান তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত কেমন বিরল!

এসংসার সার তখন, যখন ইহা সার শিক্ষা দিয়া আমাদিগকে সারবান করে, নতুবা সার বাদ দিলে ইহা কেবল সং-এর মেলা মাত্র, সেই মেলায় মনুষ্য সং বিশেষ। শিক্ষা বিষয়ে দৃষ্টান্ত অধিকতর ফলপ্রদ। শিক্ষানুসারে আমাদের পুরস্কার,—ফল লাভ। শিক্ষার আধার আমাদের হৃদয়; এই হৃদয় যত সারবান, সরস, উর্ব্বরা হইবে, তত জ্ঞানাঙ্কুর অঙ্কুরিত হইবে। যাহাতে এই হৃদয়-ভূমি উর্ব্বরা হয়, তাহার একটী বিশেষ উপকরণ এই কৃতজ্ঞতা। শিশুকাল হইতে পিতামাতা আত্মীয় স্বজন হইতে যে অপর্য্যাপ্ত উপকার-রাশি পাইয়া আমরা জীবন ধারণ করিয়া আসিলাম, সে সকল উপকার না পাইলে কতই না বিড়ম্বনা-গ্রস্ত,—সঙ্কটাপন্ন হইতাম। এমন কি এত দিন যে বাঁচিয়া আছি, কেবল সেই যত্নপ্রসাদাৎ। ইহা যদি জানিতে শিখি, তবে কি আর পিতামাতা আত্মীয়বর্গকে, অথবা কোন সামান্য উপকারী

ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া কৃতঘ্নতা-কলঙ্কে কলঙ্কিত হই? ভূমি কর্ষণ করিয়া তাহাতে সার ও জলাদি দিলে যেমন আশা মত ফল লাভ করা যায়, তেমনি শিক্ষিত হইয়া যদি কৃতজ্ঞতা ভাবের আধার হয়, তবে আর শুষ্কতা কিসের? প্রাণ কৃতজ্ঞ হইলে সে তার উপকারী বন্ধুকে আপনিই চিনিবে, পিতামাতার প্রতি ব্যবহার করিতে নিজেই জানিবে; এবং যখন সে এ শিক্ষা পাইবে, এ দীক্ষা লাভ করিবে, তখন তাহার গুরুকে সহজে চিনিয়া গুরুচরণ বন্দনা করিতে,—গুরু-দক্ষিণা দিবার জন্য সে আপনাআপনিই ব্যাকুল হইবে, এবং প্রাণ যখন ব্যাকুল হইবে, তাহার সৌভাগ্যের দ্বার আপনাআপনি খুলিয়া যাইবে। যে কারণে পিতামাতা বন্ধু গুরু বলিয়া ভক্তির আস্পদ, ঠিক সেই কারণেই কি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা মঙ্গলময় বিধাতা আমাদের পরম বন্ধু পরম-গুরু নহেন?

বাস্তবিক যদি কৃতজ্ঞ হইতে শিখি, তবে কৃতার্থ হইব। যে মঙ্গলময় বিধাতা আমাদিগকে এত সুখরত্ন নিয়তই দিতেছেন, যাহার অতুল যত্নে আমরা আজীবন প্রতিপালিত হইতেছি, এমন পরমবন্ধু যিনি, তাঁহাকে কেন জানি না, বা মানি না? তাঁর উদার প্রসাদ,—যাহা নিত্য সম্ভোগ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি, তাহা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে কেন না স্বীকার করি? তাঁহার সুমন্দ বায়ু সেবন করিব,—শীতল জলে স্নিগ্ধ হইব,—দিব্য অন্নপানে প্রাণ ধারণ করিব, অথচ এসকল তাঁর প্রেম হস্তের সুখদ দান তাহা জানিব না? এবং জানিয়া কৃতজ্ঞতা-ভরে ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে তাঁহাকে একটী বারও প্রণাম

করিব না, এ কেমন ব্যবহার, এ কিরূপ শিক্ষা? ঈশ্বর নিরাকার, তাঁহাকে দেখা যায় না বলিয়া, একবারে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হওয়া কি সমুচিত কার্য্য? বর্ণজ্ঞান শিক্ষা করিয়া পরে উচ্চ ভাষাজ্ঞান লাভ হইয়াছে,—পরে অন্য ফল লব্ধ হইয়াছে। ঈশ্বরকে প্রথমে দেখ বা না দেখ, তাঁর নিরাকার হস্তের নিদর্শন এই যে প্রসাদ দান,—বিবিধ উপচারে এই যে তোমার সুখের আয়োজন, ইহাত দেখিতেছ, ইহার জন্য কৃতজ্ঞ হও। এই কৃতজ্ঞতার স্রোতে প্রাণ-মন ঢালিয়া দেও; ভাসিতে ভাসিতে সেই প্রেম-সাগরে সহজে উপনীত হইবে। অজ্ঞান হও—সামান্য হও, কিন্তু কপট কঠিন হইও না, বরং সরলতা—ব্যাকুলতা, একান্ততা শিক্ষা কর, দুঃখ ঘুচিবে, আশা পূর্ণ হইবে। কেননা স্বর্গের জল সর্ব্বত্র পতিত হইলেও প্রস্তুত ভূমিকে তাহা যেমন শস্য উৎপাদন করিবার উপযোগী করে, তেমনি ভগবৎ-কৃপা সরস সরল কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রসাদ বিতরণ করে। তাই বলি যাঁহা হইতে সকলি, সেই যে জীবন-বন্ধু ভগবান,—তাঁহার প্রসাদ যেমন নিত্য সম্ভোগ করিবে, সেই ভোগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা-ভরে ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে স্মরণ ও প্রণাম করিবে। দর্পণের ভিতর দিয়া যেমন মুখচ্ছবি দেখ, এই প্রসাদের ভিতর দিয়া ভক্তি-নয়নে তেমনি প্রসাদদাতা দেবতাকে দেখিয়া সংশয়মুক্ত হও। যিনি প্রাণেশ্বর, তিনি বিশ্বেশ্বর সর্ব্বেশ্বর; এই দিব্যজ্ঞান সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া মোহ অহঙ্কার নাশ করিবে। ধ্রুবের সরলতা, ব্যাকুলতা,—প্রহ্লাদের একান্ততা নির্ভরশীলতা শিখিলে

অভিষ্ট নিশ্চয় সিদ্ধ হইবে। কেননা ভক্তের মনোবাঞ্ছা ভক্তবৎসল শ্রীহরি চিরকাল যুগে যুগে পূর্ণ করিয়াছেন; এক্ষণেও করিবেন।

সম্বন্ধযোগ।

(১)

জগতের পারিপাট্য-ব্যাপার আলোচনা করিলে, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বিশ্বমাঝে এক অত্যাশ্চর্য্য সম্বন্ধসূত্রই সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলার হেতু। এই সূত্র ছিন্ন হইলে অনেক বিপ্লব ঘটে, বিপ্লব, বিশৃঙ্খলার অন্যবিধ নাম-মাত্র। যেখানে বিশৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্যের অভাব যে সেখানে বিদ্যমান, তাহাতে আর সংশয় নাই। কি জড়জগৎ—কি ভৌতিক রাজ্য—কি মর্ত্ত্য—কি অন্তরীক্ষ, যে দিকে দৃষ্টি করা যায়, এই সম্বন্ধ-সূত্র সকলকে যেন অপূর্ব্ব অদৃশ্য যোগে বাঁধিয়া বিধাতার লীলা-রহস্য সৃষ্টি মধ্যে প্রকাশ করিতেছে। যাঁহারা ভাবুক, তাঁহারা এ রহস্য যতই দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে ভেদ করিতে সমর্থ হন, ততই তাঁহারা ভাবাবেশের পরবশ হইয়া স্রষ্টার মহিমা গানে রত হইয়া থাকেন।

মাধ্যাকর্ষণ ও যোগাকর্ষণ পরস্পরকে আলিঙ্গন দানে এই সম্বন্ধ-সূত্রকে আরো দৃঢ়ীভূত করিয়াছে সুতরাং সৃষ্টির সৌন্দর্য্য-চ্ছটা তদ্দ্বারা আরও অক্ষুণ্ণভাব ধারণ করিয়া, কাল পরম্পরায় অপ্রতিহত রূপে প্রকাশিত হইতেছে। যত প্রকারে আমরা আলোচনা করি না কেন, এই সম্বন্ধ-সূত্র সকলের মধ্যে যে কার্য্য করিতেছে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে যে

অকাট্য-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। অদৃশ্য নিয়ম-সূত্রে প্রকৃতি যেন বাঁধা পড়িয়া মঙ্গলময় বিধাতার নিয়তি চক্রে আবহমান কাল ঘূর্ণায়মান হইয়া চলিতেছে। এই সম্বন্ধযোগ আবার দেখা যায়, জড়, ভৌতিক ও প্রাণি-জগতে জীবনধারণ ও সঞ্চারণের উপায় হইয়া চারিদিকে জীবন সঞ্চারিত করিতেছে। আর গগন-মণ্ডলে সূর্য্য চন্দ্র তারকাগণ যেন এই সম্বন্ধকে সম্মানপূর্ব্বক আপনাদের স্ব স্ব মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে। উদ্ভিদ্-রাজ্যে এই সম্বন্ধযোগই উহার বৃদ্ধির কারণ উদ্ভাবন করিতেছে; এবং প্রাণি-জগতে এই সম্বন্ধ-প্রভাবে পুঞ্জ পুঞ্জ প্রাণী প্রাণ-লাভ ও প্রাণ ধারণ করিতেছে। সকলেই আপন আপন পরিধির মধ্যে এই সূত্রকে অবলম্বন পূর্ব্বক কেবল সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি কৌশল ও মহিমা প্রকাশ করিয়া অপর সকলকে ধন্য করিতেছে; ও আপনারাও ধন্য হইতেছে।

এই অকাট্য সম্বন্ধ-সূত্র মনুষ্য-মণ্ডলীর মধ্যেও অতি সুন্দর বিচিত্রভাবে কার্য্য করিতেছে। মনুষ্য স্বাধীন হইয়াও এই নিগূঢ় বন্ধন হইতে একেবারে মুক্ত নহেন। অন্যান্য মণ্ডলীর মধ্যে এই সম্বন্ধ লৌহ-শৃঙ্খলের মত সকলকে অকাট্য-বন্ধনে বাঁধিয়া অপ্রতিহত ভাবে বিধাতার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছে। কিন্তু মানবমণ্ডলীর মধ্যে মনুষ্যের স্বাধীনতা-সম্ভূত অত্যাচার সত্ত্বেও ইহার পরাক্রম অনতি-ক্রমণীয় রূপে কার্য্য করিয়া আসিতেছে। অযথা স্বাধীনতা প্রযুক্ত অবোধ মনুষ্য যত এই সম্বন্ধকে অবমাননা করে, ততই সে তাহার অবনতির ও যন্ত্রণার কারণ উদ্ভাবন

করে। কিন্তু এই সম্বন্ধ-সূত্রের গভীরতা—পবিত্রতা সে যত অনুভব করে, ও অনুভব করিয়া ইহার মর্য্যাদারক্ষা করিতে যত্নবান হয়, ততই সে ঐশ্বর্য্য ও শান্তি লাভ করিতে থাকে। যদি বিধাতা এই সম্বন্ধ-যোগের ভিতরে এক অপূর্ব্ব রস সঞ্চার না করিতেন, তবে পারিবারিক বন্ধন, আত্মীয়ের আকর্ষণ, বন্ধুর আলিঙ্গন, সুকুমার কুমারের সুধাংশু সদৃশ হাস্য-বদন, যাই কেন বল না,—এসব কি সুখের কারণ হইতে পারিত? পিতামাতার বাৎসল্যভাব, ভাইভগ্নীর সরল প্রেমোচ্ছ্বাস, বন্ধুর প্রিয়দর্শন ও পতিপত্নীর গভীর প্রেম, ইহা কি সুখের সম্বন্ধজনিত নহে? কে তাহা অস্বীকার করিবে? কিন্তু এই সম্বন্ধ এত সুখের হেতু হইয়াও ইহা নিরবচ্ছিন্ন সুখের কারণ হইতে ও নিত্য সুখ দান করিতে পারে না;—যেন আশা কতক অপূর্ণ থাকিল,—সব সাধ মিটিল না। যিনি এত যত্ন ও কৌশল-বলে এমন সুখের উপকরণে আমাদের জীবন-রূপ নাট্য-মন্দিরটী সাজাইলেন, তিনি কি কোনই সঙ্কল্প করেন নাই? অবশ্যই ইহার নিগূঢ় কারণ আছে। এত নানা রকমের ভালবাসা,—এসব কি একেবারেই বিলুপ্ত হইবে? গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখ, ইহার সন্ধান পাইবে। যত বাহিরে দেখিবে, ইহার বিস্তৃত, বিচিত্র, তরল বিকাশ দৃষ্টিগোচর হইবে, কিন্তু কোথায় ইহার সেই ঘনীভূত অবস্থা, যাহা বাহ্যাবস্থাকে অতিক্রম করিয়া নিত্যকাল স্থিতি করিতেছে, ও এই সংসার মরুভূমির মধ্যে শ্যামল-ভূখণ্ড রূপে শ্রান্ত পথিককে শান্তির আভাস দিতেছে?

পিতামাতা পুত্রকলত্র আত্মীয় স্বজন পরিবারবর্গ ও

সুহৃদবৃন্দের সহিত এই সব বিচিত্র সম্বন্ধ, যেন মানবের জীবন-বৃক্ষের বিবিধ শাখাপ্রশাখা রূপে বহু ফুল ফল প্রসব করিয়া তাহার নানারূপ শোভা বিকাশ করে। সে শোভা আবার সুখের কারণ হইয়া মানব-হৃদয়ের কত আরাম ও আশা দান করে। কিন্তু বৃক্ষের শাখাদি যেমন বায়ুর ক্রীড়ার বস্তু, সম্বন্ধের এই সব বাহ্য উপকরণ তদ্রূপ পরিবর্ত্তনশীল। তাই এত যে সুখের সামগ্রী তাহাও দুঃখের কারণ হয়। তবে কি এসম্বন্ধ কেবল প্রবঞ্চনা—ছলনার কারণ? প্রবল ঝটিকা বৃক্ষের শাখাপ্রশাখাকে আন্দোলিত করে, মূল কিন্তু সুদৃঢ়,—সহসা বিচলিত হয় না। অতএব জীবনের বিচিত্র শোভাময় সম্বন্ধে অন্ধ হওয়া সুবুদ্ধি-সম্পন্ন মানবের উচিত নহে। ইহার শোভা কোথায়?—মূলদেশ আছে কি না? তদনুসন্ধান করা একান্ত বিধেয়। সেই মূল কোথায়? যে অনুসন্ধিৎসু হইল, সে দেখিল আমি আছি, আমার প্রিয় বস্তু স্নেহপ্রেমের আস্পদ আছে, এ সকলের মূল অবলম্বন স্বরূপ সেই আদিশক্তি;—যে শক্তি দ্বারা সমুদয় সৃষ্টির ব্যাপার বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে,—তাহার মধ্যে আমি ও আমার বলিবার যাহা কিছু সকলই অবস্থিতি করিতেছে। এই সত্য যখন আবিষ্কৃত হইল,—ইহার সন্ধান যখন পাওয়া গেল, তখন মানব-হৃদয় আশা ভরসা স্থাপনের একটী অবলম্বন-ভূমি পাইয়া নিশ্চিন্ত হইল; সমুদয় অবস্থার অত্যাচার ও জীবনের সমস্ত ক্ষতিপূরণের ও সর্ব্বপ্রকার অভাব অনাটন ও বিচ্ছেদের মোচন, মিলন ও সামঞ্জস্যের স্থান লাভ করিল। শান্ত সংযত ও বিশ্বস্ত হইয়া যত মনুষ্য

স্তমুখীন হইবে, ততই এই গূঢ় রহস্যের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন রিয়া সে মুগ্ধ হইবে।

বীজের অন্ধকারময় উদরে যেমন বৃক্ষের আবশ্যকীয় পকরণ নিহিত, সেই রূপ সম্বন্ধের আকর সর্ব্বময় বিশ্ব-ারণের মধ্যে আমাদের সম্বন্ধ সমস্তই ঘনীভূত। বাহ্যজগৎ ়অপর প্রাণিপুঞ্জ যেমন সেই অনাদি মূল কারণের আনু-ত্যাধীন হইয়া নিয়তির স্রোতে আপনাদিগকে ভাসাইয়া িতেছে। মনুষ্য সেইরূপ সেই বিচিত্র-সম্বন্ধ-প্রদাতা দেবতাকে র্ব্বমূল কারণ জানিয়া তাঁহাকেই আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া াহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলে, তাহার সকল দুঃখের বসান হয়, এবং যে প্রিয়বিয়োগ, আত্মীয় বিয়োগ ও বন্ধু-বিয়োগের জ্বালা আর কিছুতেই নির্ব্বাণ হইবার নহে, াহা সেই সকল বন্ধুতার কারণ যে পরমবন্ধু পরমেশ্বর, াঁহাকে লাভ করিলে পর্য্যবসিত হয়। বাহ্য বিচ্ছেদের ারণ সেই যোগেশ্বরের নিকটে উপশমিত হয়; প্রাণ ান্ত্বনা ও শান্তিলাভ করে। অতএব এই সম্বন্ধের কারণ য পরম কারণ পরমেশ্বর, মনুষ্য যোগ-বলে যথন তাঁহাকে কল সম্বন্ধের ভিতর বিরাজমান দেখিতে আরম্ভ করে, পিতা মাতা সন্তান সন্ততি আত্মীয় স্বজন ঐশ্বর্য্য সাম্রাজ্য মুদয়ের কারণ তিনি, ইহাদের অভাব ও বিচ্ছেদ তাঁহাতে ব পরিপূরিত, দিব্যজ্ঞানালোকে, যোগ-বলে মানবের হৃদি-ন্দিরে যথন এ রহস্য বিকশিত হয়, তথন সাংসারিক জীব-নের সমস্ত ক্ষতি সেই শ্রীহরির শ্রীচরণে পরিপূরিত হয় ানিয়া মানব তৃপ্তিলাভ করে। এই গূঢ় ভাববেশে বিভোর

হইয়া ভক্তেরা অবস্থা জয় করিয়া ভগবদ্ভক্তির জ ঘোষণা করিলেন। অতএব এই সম্বন্ধের প্রস্রবণ যে ভগবান, তাঁহাতে মানব যতই অনুপ্রাণিত, ততই তার শান্তি-তৃপ্তি, নতুবা দুর্গতি অনিবার্য্য। তাই বলি ভবের সমস্ত বিভব দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, ভগবদ্ভক্তিতে মানবজীবন বৰ্দ্ধিত হউক; কেননা তদ্ভিন্ন সুখ শান্তি সান্ত্বনার আর উপায়ান্তর নাই।

সম্বন্ধযোগ।

(২)

সম্বন্ধযোগ অবিচ্ছিন্ন—নিত্যযোগ। জড় জগতের সঙ্গে—প্রাণিপুঞ্জের সঙ্গে ইহার যোগাযোগ বিষয়ে আমরা আলোচনা করিয়াছি; এক্ষণে আর একটী বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হই। জীবনের অবস্থার সঙ্গে ইহার সম্পর্ক কিরূপ ব্যাপ্ত, তাহা একবার চিন্তা করা যাউক। অবস্থা-দর্পণে ঘটনার প্রতিকৃতি দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হই। সংসারে নানা পরিবর্ত্তন,—ঘটনাচক্রের বিবিধ আবৰ্ত্তন, কিন্তু সম্বন্ধসূত্র তথাপি ছিন্ন হইবার নহে। সম্বন্ধের ভিতর প্রেমাকর্ষণ, সম্বন্ধের সংরচয়িতা কর্তৃক সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। ঐ যে ভালবাসা, সম্বন্ধের মধ্যে সঙ্গোপনে সংরক্ষা করা হইয়াছে, উহা দ্বারাই বিচ্ছেদ অসম্ভব হইয়াছে। লোকে মনে করে, বুঝি ইহা কেবল ইহকালের যোগ;—বুঝি মৃত্যু এই যোগ ছিন্ন করে। কিন্তু তাই বা কই? ইহা যে চিরকালের যোগ; ইহা পরকালপর্য্যন্তব্যাপী। যে প্রেমের পুতুল দেখিয়া

আমরা সদা মোহিত,—যে ভালবাসার সামগ্রীতে এত মুগ্ধ, মৃত্যু সহসা আসিয়া তাহাকে সরাইল সত্য, কিন্তু তাহাতে কি সম্বন্ধ ছিন্ন হইল? প্রবল ঝটিকা প্রকৃতির অবস্থার পরিবর্ত্তন করিল, তাহাতে তাহার মুখমণ্ডল কি উজ্জল করিয়া দিল না? বারিধারা বর্ষিত হইয়া তাহার সংস্কার কার্য্য সিদ্ধ করিল, তাহাতে প্রকৃতির বিকৃতি কোথায়? মৃত্যু আমাদের প্রাণের প্রিয় বস্তুকে স্থানান্তরিত, অবস্থান্তরিত রূপান্তরিত অথবা ভাবান্তরিত করিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বস্তুর বস্তুত্ব কি লোপ করিতে পারিল? সে আমাদিগকে ক্ষণকাল কাঁদাইল,—বিচলিত করিল; কিন্তু তাহাতে কি আমাদের দিব্যজ্ঞান সমুদিত করিয়া দিল না? তাহাতে কি আমাদিগের সমক্ষে এক অপূর্ব্ব পথ আবিষ্কৃত করিল না? যে সম্বন্ধের বস্তুকে,—ভালবাসার সামগ্রীকে, প্রেমের আস্পদকে এত আদর করিতাম,—মায়ার জঞ্জাল মোহের আবর্জ্জনা যার উপর পড়িয়া যাহার স্বাভাবিক কান্তি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল,—মৃত্যু তাহাকে অন্তর্ধান করিল;—সেই প্রাণের রত্ন-হারা করিয়া তোমাকে আমাকে যেন আত্মাহারা করিল, কিন্তু এই অবস্থার অন্ধকারে আর একটী কেমন ঘটনার ছবি প্রকাশিত হইয়া পড়িল, একবার দেখ দেখি। আমরা শুনিয়াছি যে, মহাত্মা কলম্বস্ এক বোঝা কাষ্ঠ ভাসিয়া আসিতেছিল দেখিয়া, নূতন ভূখণ্ড আবিষ্কারে বিলক্ষণ আশ্বাসিত হইয়াছিলেন। আমাদের প্রাণের আত্মারাম কলম্বস্ অন্ধকারময় মৃত্যুর সাগর-বক্ষে সম্বন্ধ-সূত্র-জড়িত প্রেমের উপকরণ কি দেখিতে পায় না? এবং দেখিয়া নূতন

সম্বন্ধ-জগৎ আবিষ্কার করিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ কি ঘুচাইল না? এই ঘোর সঙ্কট সময়ে প্রশান্তমূর্ত্তি আত্মারাম কলম্বস্ মৃত্যুর অন্ধকারময় অবস্থা-যোগে মহাযোগের সন্ধান আবিষ্কার করিলেন। যে যোগ ইহ ও পর জগৎকে একসূত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, এই সত্য আবিষ্কার করিয়া এক নূতন অধিকারে অধিকারী হইলেন। দেখ, এখন কেমন মৃত্যুর ভিতর দিয়া ইহকালে অবস্থিতি করিয়া পরকালের আভাস লাভ হইল। প্রাণাধিক প্রিয়তম বন্ধুর বিয়োগে যে প্রাণ বিচ্ছেদানলে নিয়তই যেন দগ্ধ-বিদগ্ধ হইতেছিল, প্রাণসম স্নেহবৎসল পুত্র কলত্রদিগকে হারাইয়া মণিহারা ফণির ন্যায় যে বিচলিত প্রাণ হইয়াছিল,—জীবনানন্দদায়িনী প্রিয়তমা ভার্য্যার বিয়োগে যাহাকে শান্তিহারা করিয়াছিল, সে প্রাণ এখন মৃত্যুর উপত্যকায় অবস্থিতি করিয়া, অমৃতধামের আভাস পাইল, এবং তথায় মৃত্যু-কবলিত আত্মীয়বর্গের সঞ্জীবিত ভাবের পরিচয় যখন লাভ করিল, তখন সম্বন্ধ যোগে যে মহাযোগ—মহাভোগ ইহা কেমন সহজে প্রতিপন্ন হইল। যে ভালবাসার জন্য বন্ধু বিয়োগে লোকে হাহাকার করে, সেই ভালবাসা এই আশ্চর্য্য যোগ-সূত্র প্রকাশ করিয়া সম্বন্ধ-যোগের মাহাত্ম্য প্রকাশিত করিল,—মনুষ্যের সান্ত্বনার ভূমি আবিষ্কার করিয়া তাহাকে আশ্বাসিত করিল। যাঁহাকে বাহিরে হারাইয়া আমরা আত্মহারা হইয়াছিলাম, এই ছিল, কোথায় গেল, ইহা ভাবিতে প্রাণের তার বাজিয়া উঠিল; আর সেই শব্দ নিত্যযোগের সম্বন্ধ ঘোষিত করিল—বিবেকের ভেরী বাজিল,—আর স্বর্গের সুসমাচার নিনাদিত হইল।

ম্বন্ধসম্ভূত ভালবাসা, যাহা প্রাণাধিক প্রিয়তম বন্ধুর বিয়োগ হতু আমাকে এত ব্যাকুল করিয়াছিল, সেই সম্বন্ধের টান াহির হইতে আমাকে ভিতরে লইয়া গেল; এবং তথায় ম্বন্ধের আশ্চর্য্য গূঢ়রহস্য বিকশিত করিয়া দিল। এক নূতন ্যাপার প্রকাশিত এক নূতন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। চত্রকর যেমন কাল জমীর সহায়তাতে সুন্দর ছবি আঁকিয়া াকে, তেমনই মৃত্যুর অন্ধকারময় অবস্থায়, ইহকালে বসিয়া রকালের ছবি মানস-পটে তুমি আমি প্রতিবিম্বিত দেখিয়া মাহিত হই। তাড়িৎ-বার্ত্তাবহের তার ভূমি-পৃষ্ঠে স্তম্ভো- রি স্থাপিত, এবং কোথাও বা সাগর-গর্ভে লুক্কায়িত, কিন্তু নয়তই যোগসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বার্ত্তা বহন করিতেছে। মামাদের সম্বন্ধযোগ তদ্রূপ বাহ্য ও আভ্যন্তরিক অবস্থার ংযোগে ইহকাল পরকালকে একত্র সংযুক্ত করিয়া বিবিধ মবস্থার অত্যাচার ও মৃত্যুসম ভয়ঙ্কর ঘটনা সত্ত্বেও নিত্য- যোগের পরিচয় দিতেছে। বিধাতাকর্তৃক কালের ভেরী নিয়- তই বাজিতেছে; ঘটনার ঘণ্টা সততই নিনাদিত হইতেছে; কিন্তু শুনে কে? শুনেন কেবল যোগী প্রেমিক যাঁহারা। অশ্বত্থের বীজ সূক্ষ্ম হইলেও কালক্রমে প্রকাণ্ড বিটপী নমুৎপন্ন করিয়া শ্রান্ত পথিকের শ্রান্তি দূর করে,—প্রাণ শীতল করে, এই সম্বন্ধযোগ যোগীর আদরের সামগ্রী হইয়া, তাঁহার ভাবময় হৃদয়ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া, তাঁহার প্রাণে কেবল যে বহুল সুখদান করে এমত নহে কিন্তু কল্পতরু সদৃশ সকল আশ্রিত জনকে ছায়া দান করিয়া তাঁহাদিগকে শীতল করে।

তাই এই সম্বন্ধরূপ কল্পতরুলতা যখন বিধাতা কর্তৃক মহাসঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য—জীবের শ্রান্ত প্রাণকে শীতল করিবার জন্য, তাহার হৃদয়কাননে একবার অঙ্কুরিত হইয়াছে, তখন ইহা সমস্ত অবস্থাভেদ করিয়া,—সমুদয় ঘটনাচক্র অতিক্রম করিয়া, নিত্য বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, কে তাহাকে বাধা দিবে, বিনাশ করিবে? পুরাণে মহাত্মা যুধিষ্ঠিরাদির ক্রিয়া-কলাপ—তাঁহাদের জন্ম, মরণ ও স্বর্গে মিলন, এই সম্বন্ধযোগের বিবরণটী কেমন সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা এত অবস্থার প্রলয় সত্বেও কেমন সম্বন্ধযোগে আবার যুক্ত ও পুনর্ম্মিলিত হইলেন। জ্ঞানের তারতম্যানুসারে যেমন ভাবের ভিন্নতা সংঘটন করে, দর্শনভেদে যেমন বস্তুতে ভেদ জ্ঞান সমুৎপাদিত করে, রোগ ঠিক নির্ণীত না হইলে ঔষধ যেমন ফলোপধায়ী হয় না, তেমনি প্রকৃত বিচক্ষণ না হইলে, বিলক্ষণ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিতে না পারিলে, অবস্থাদর্পণে ঘটনাবলীর প্রকৃত ছবি অবলোকন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। নগ্নচক্ষে সূক্ষ্ম বস্তু দৃষ্টি হয় না, দূরবীক্ষণ এসম্বন্ধে কেমন সুন্দর সহায়! তদ্রূপ অন্তর্দৃষ্টিকে যোগাঞ্জনে বিভূষিত কর, সম্বন্ধযোগের ভিতর কত অপূর্ব্ব দিব্য বস্তু দেখিয়া সুখী হইবে। ইহার ভিতর ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম চতুর্বিধ ফল লাভ করিয়া ভগবানে আত্ম-সমর্পণ ও জীবের সেবায় প্রাণ মন বিসর্জ্জন করিয়া কৃতার্থ হইবে। সম্বন্ধযোগ যে কর্ম্মভোগ নহে, কিন্তু প্রকৃত অমৃত সম্ভোগ, ইহা উপলব্ধি হইবে।

দুই শ্রেণী।

সাধারণতঃ এই সংসারে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়। একদল সংসারাসক্ত, অপর দল ধর্ম্মানুরক্ত। মনুষ্য-প্রকৃতি একই উপাদানে গঠিত হওয়া সত্ত্বেও কেন যে মনুষ্যের এত কার্য্যের বৈপরিত্য, রুচির বৈষম্য এবং মতির তারতম্য, ইহা এক বিষম সমস্যা। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহার বিবিধ মীমাংসা করিয়া সন্তোষকর সিদ্ধান্ত করিতে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা বলা কঠিন। মনুষ্য-প্রকৃতি বিচিত্র ভাব ও শক্তিতে সংগঠিত। সেই বিচিত্র গুণের সামঞ্জস্যের অসদ্ভাব প্রযুক্ত এত বৈষম্য সমুপস্থিত হয়। কেহ বলেন, নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করাতেই মনুষ্যের এই দুর্বিপাক ঘটিল, অথবা ঈশ্বর-প্রদত্ত স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া কোথায় সে আপনার স্রষ্টার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবে, না সে সেই স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত করিয়া এতাধিক বৈপরিত্য ঘটাইল। যাই হউক ফলে মোটামুটী দুই শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে বিরাজমান দেখা যায়। একদল লোক "ধনং দেহি, মানং দেহি, যশো দেহি" ইত্যাকার প্রার্থনায় ব্যস্ত। এই মূলমন্ত্র দ্বারা তাহারা আপন আপন উপাস্য দেবতার পূজা করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিসে সংসারের উন্নতি, ধন মান ঐশ্বর্য্য ও পার্থিব সঙ্গতি বৃদ্ধি হয়—এই যেন তাহাদের কার্য্যের চরম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহারা যাগ, যজ্ঞ, পূজা, অর্চ্চনা, স্বস্ত্যয়নাদি ক্রিয়া-কলাপ আড়ম্বর ও ধূমধাম সহকারে সম্পন্ন করিতে যেন সদাই

ব্যস্ত। ইহারা নিজে অসার, সার বস্তু কি তাহা জানে না, সুতরাং তাহার জন্য ইহাদের তাদৃশ চেষ্টা ও যত্ন নাই। প্রত্যুত অসার অস্থায়ী বিষয়ের জন্য,—অশ্ব গজ ধন মান বিষয় বিভব এই সকল বস্তু পাইবার জন্য, দেবতার সন্তোষ বর্দ্ধন করিবার জন্য, বিবিধ আয়োজনে সদাই ব্যস্ত। ফলতঃ সংসারকে লক্ষ্য করিয়া ইহারা ভগবানের শরণাগত হয়, আপনাদিগের কামনা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার দোহাই দেয়, চীৎকার রবে তাঁহার নাম গ্রহণ করে। ভগবানের ভাণ্ডার অবারিত। তিনি কল্পতরু হইয়া সকলের কামনা পূর্ণ,—অভাব মোচন চিরকালই করিয়া আসিতেছেন। মনুষ্য তাঁহাকে মান্য করুক বা না করুক, তিনি নিয়তই তাহার মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত। রাজ্য, সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সুখ, শান্তি, আরাম, স্বাস্থ্য, সকলই তাঁহার সামগ্রী, সকলই তাঁহারই প্রদত্ত ; মনুষ্য যাহা কিছু সম্ভোগ করে, সকলই সেই ভগবানের। এই প্রাগুক্ত দলের লোক এ সকল সুখ সম্ভোগের জন্য ভগবান্‌কে ডাকিয়া থাকে, স্বার্থসাধন যেন ইহাদের সর্ব্বস্ব। কিন্তু অপর আর শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা সর্ব্বাগ্রে ভগবান্‌কে চান, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে "স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ" করেন, বিষয় বিভব মান সম্ভ্রম অস্থায়ী অকিঞ্চিৎকর অসার পদার্থ, কিছুই চান না ; সকল সময়েই কেবল ভগবানের আশ্রয় ভিক্ষা করেন। কেননা তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, তিনিই সারাৎসার—সর্ব্বমূলাধার। একদল লোক স্থূলদর্শী, সুতরাং স্থূল পদার্থ সুখের মূল মনে করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হয় ; অপর দল পরিণাম বা দূরদর্শী হইয়া সূক্ষ্ম নিরাকার রাজ্য নিত্য ও

সার জানিয়া তাহারই অন্বেষণে ব্যাপৃত হন। পৃথিবীতে পরীক্ষা পদে পদে; কিন্তু এই পরীক্ষা স্থূলদর্শী অজ্ঞানীদিগের যন্ত্রণার কারণ হয়—কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানীদিগকে শিক্ষার উপকরণ বিধান করে। একদল স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্য বলিয়া ভগবানকে ডাকে, অপর দল "স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যম্" এই ব্রত অবলম্বন করিয়া ভগবানে মনঃ প্রাণ সমর্পণ ও নির্ভর করেন। যত্ন অনুসারে যেমন রত্ন লব্ধ হয়, তেমনই সঙ্কল্প ও ব্রত অনুসারে কামনা সিদ্ধ হয়। আমরা এই বিষয়টী বিশদরূপে আমাদের পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য মহাভারতের কুরুপাণ্ডবের উপাখ্যানের তাৎপর্য্য নিম্নে বিবৃত করিলাম।

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের আয়োজন সম্বন্ধে দুই পক্ষই বৈকুণ্ঠাধিপতির সহায়তা নিতান্ত প্রয়োজনীয় উপলব্ধি করেন, এবং তজ্জন্য দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন উভয়েই তাঁহার সাহায্য-প্রার্থী হন। কথিত আছে, দুর্য্যোধন সমস্ত অবস্থা বৈকুণ্ঠপতিকে অবগত করিয়া তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। তদুত্তরে বৈকুণ্ঠাধিপতি বলিলেন, "আমি স্বয়ং আছি ও আমার অগণ্য নারায়ণী-সৈন্য আছে, আমি এ উভয়ই তোমাকে অর্পণ করিতেছি, তোমার যাহা ইচ্ছা তুমি লইতে পার"। স্থূলদর্শী রাজা দুর্য্যোধন বৈকুণ্ঠপতিকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার প্রদত্ত সৈন্য সামন্ত সংগ্রামের বিশেষ সহায় মনে করিয়া তাহা লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। দীনাত্মা অর্জ্জুন আপনাদের সহায় সম্বল একমাত্র বৈকুণ্ঠাধিপতি, ইহা জানিয়া ও তাঁহার সাহায্য নিতান্ত আবশ্যক স্থির বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং বিনীত

ভাবে মনোভাব তাঁহাকে ব্যক্ত করিলেন। বৈকুণ্ঠপতি উত্তর করিলেন, "আমার সৈন্য সামন্ত যাহা কিছু ছিল, সব রাজা দুর্য্যোধনকে দিয়াছি। আমার ত আর কিছু নাই, যে তোমাকে দিব"। অর্জ্জুন দীনভাবে বলিলেন, "আমি আপনার সৈন্য সামন্ত লোক-বল, ধনবল কিছুই চাই না। আমরা আপনাকেই চাই, আপনি নিজে আমাদের সহায় সখা হন, এই আমাদের প্রার্থনা"। প্রার্থনা শুনিয়া বৈকুণ্ঠপতি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া অসংখ্য অগণ্য সৈন্য সামন্তে পরিবেষ্টিত হইয়া রণজয়ী হইবেন, তাহাতে সংশয়-বিহীন হইলেন। অপর পক্ষে নিরাশ্রয় পঞ্চ পাণ্ডব বৈকুণ্ঠপতি একমাত্র সহায়, ইহার উপর নির্ভর করিয়া রণে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধের পরিণাম সকলেই অবগত আছেন। রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্য সামন্ত মহারথী সারথী সব বায়ু-নিক্ষিপ্ত তুষের ন্যায় যেন কোথায় উড়িয়া গেল। পাণ্ডব-দিগের জয়লাভ হইল। স্থূল বিষয় বিভব যে অসার, প্রত্যুত সূক্ষ্ম বিশ্বাস ভক্তি যে সার, তাহাই সাব্যস্ত হইল।

কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ কি কেবল ঐতিহাসিক ঘটনা? ইহা কি কেবল পুরাণ-ইতিহাসে আবদ্ধ? স্থির হইয়া ঘটনা-তত্ত্ব পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই যুদ্ধ সকল জাতি মধ্যে সকল বংশে নিয়তই চলিতেছে। আমাদের মধ্যে দুর্য্যোধনের বংশের লোকের কি অপ্রতুল? বিশ্বাসী পাণ্ডব দলের সংখ্যা চিরকালই সকল দেশেই বিরল। পৃথিবীর প্রায় সকল মনুষ্য ঈশ্বরের নাম লইয়া থাকে, এবং তিনি যে

এক জন আছেন, তাহা বিশ্বাস করে। সকল অবস্থার লোকেই কি জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ধনী, দরিদ্র সকলেই তাঁহাকে মান্য করে। এই কলিযুগে দুর্য্যোধনের বংশের লোকের অভাব নাই। তাহারা আড়ম্বরসহকারে চীৎকার-রবে ভগবানকে ডাকিতে বিলক্ষণ তৎপর, এবং সংসারের ধন মান লক্ষ্য করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকে। সাংসারিক কোন ক্ষতিগ্রস্ত ও রোগাদির আশঙ্কা হইলে, তাহারা অমনই ধূমধামসহকারে দেবতার পূজার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের পরিণাম রাজা দুর্য্যোধনের পরিণাম অপেক্ষা আর কি অধিক হইতে পারে? সংসারের ভাগ্যবানদিগের দশার ন্যায় তাহাদিগের দশা হয়। আজ ধন মান ঐশ্বর্য্যে উন্মত্ত, কাল রোগ শোকে দুঃখ দারিদ্র্যে অবসন্ন, সংসারের এই দশা। কিন্তু ধন্য সেই অল্পসংখ্যক প্রকৃত বিশ্বাসী বংশ, যাঁহারা পাণ্ডবদিগের ন্যায় ঈশ্বর-প্রাণ হইয়া কেবল তাঁহাকে প্রাণ মন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেন ও জীবনের সমস্ত ফলাফলের জন্য কেবল তাঁহার উপরি নির্ভর করেন। সংসারে বিপদ পদে পদে; কিন্তু এই বিপদ অসার হইতে সারকে পৃথক্ করিয়া সত্যের মহিমা ও গৌরব রক্ষা করিয়া থাকে। অগ্নি যেমন স্বর্ণকে দগ্ধ করিয়া তাহাকে খাঁটি করে, তদ্রূপ বিপদ, পরীক্ষা, বিশ্বাসীর ভাব ভক্তিকে ঈশ্বরেতে আরও ঘনীভূত করে। পাণ্ডবদিগের বিপদ পরীক্ষার বিষয় কে না অবগত আছেন, অথচ সত্যের মহিমা তাঁহাদের জীবনে কেমন মহিমান্বিত হইল? অতএব অসত্যের জয় ক্ষণকাল, কিন্তু "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"; ইহাই

সনাতন শাস্ত্র। ইহা মনুষ্যমাত্রেই যত পালন করিবে, তত সদ্ভাব ও শান্তি মানবমণ্ডলীমধ্যে আবির্ভূত হইয়া মনুষ্য-সমাজ স্বর্গের শোভা ধারণ করিবে। তাই বলি, অসার অসত্য বাহ্যাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া, সত্য সনাতন ভগবানের শরণাপন্ন হও; চির শান্তিতে জীবন সহজে অতিবাহিত হইবে।

মাদকতা।

আমরা মনুষ্য-সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই যে, মাদক-সেবন সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যেই, কোন না কোন প্রকার প্রচলিত। ইহার দ্বারা এখনও বোধ হয় যে, যেমন ভোজন পান, মনুষ্য-প্রকৃতির নিতান্ত প্রয়োজনীয়, মাদক-সেবনও তেমনই তাহার দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়। অবস্থা, শিক্ষা ও সভ্যতা-ভেদে যেমন এই ভোজন পান সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট-অপকৃষ্টতা দৃষ্ট হয়, মাদকতা সম্বন্ধেও তদ্রূপ। ঔৎকর্ষ সভ্যতার পরিচায়ক। এই সভ্যতা মনুষ্যজীবনের উন্নতির প্রকাশক। এই উন্নতির ভিত্তি কোথায়? এই তত্ত্বে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, যতই যাহার ভিত্তি দৃঢ়, ততই তাহা সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত, ততই অসার হইতে তাহা দূরে অবস্থিত। এই রূপে কার্য্য-কারণ-প্রণালী অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলে, অবশেষে, সাত্ত্বিকতা যে মনুষ্যের উন্নতির আশ্রয় ভূমি, ইহাই প্রমাণিত হইবে। এই সাত্ত্বিকতা কি? না, যাহা যতই অসারতা-বিবর্জ্জিত, যতই সত্যেতে আশ্রিত অথবা সত্যসংঘটিত, ততই

তাহাকে সাত্ত্বিক বলা যায়। এখন স্থির ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই সাত্ত্বিকতাকে আশ্রয় করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। মনুষ্য-আত্মা সার বস্তু,—শরীর অসার। অথচ বিধাতার বর্ত্তমান ব্যবস্থা এই যে, এই শরীর আত্মার সেবকরূপে শুশ্রূষা করিবে। এখন দেখা উচিত, শরীর যদি আত্মার সেবক হইল, তবে তাহাকে এমন করিয়া সেবা করিবে, এমন সকল উপকরণ তাহার সেবার জন্য সংগ্রহ করিবে, আয়োজন করিবে, যাহাতে আত্মার উন্নতির কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে। সুতরাং শরীরকে আত্মার অধীন হইয়া চলিতে হইবে। ফলতঃ আত্মা-প্রভুর প্রকৃতি অনুসারে শরীরকে যথাসাধ্য সাত্ত্বিকতা অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। শরীর রক্ষার জন্য যে সমস্ত ভোজন পান সাত্ত্বিকতা রক্ষা করে, সেই সমস্তই, প্রকৃতপক্ষে উপ-যোগী। এখন দেখা যাউক ;—মাদক দ্রব্য গ্রহণের পরিণাম মত্ততা। ইহার উপকরণ গুলি অসার পদার্থ এবং সাত্ত্বি-কতার প্রতিকূল বলিয়া, এই মত্ততা আত্মার ভয়ানক অনিষ্টকারী। সুতরাং শরীর আত্মা-প্রভুর প্রতি অত্যাচার এবং উৎপাত করিলে, প্রভু ও সেবকের সম্বন্ধ অতিক্রম করিল, ইহা তাহার সমুচিত নহে; কারণ ইহা মনুষ্যত্ব বিনাশক, সুতরাং পরিত্যাজ্য। এইরূপ পাশব ভোজন-পান, আচার-ব্যবহার চিরদিনের জন্য পরিত্যাজ্য। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে হইলে যে আহার পান সাত্ত্বিকতা রক্ষা করে, তাহাই শ্রেয়ঃ।

আর একটা বিশেষ কথা,—যে সুরা শ্রেষ্ঠ মাদক

বলিয়া প্রচলিত, তাহা বস্তুর বিকার হইতে প্রস্তুত। যাহার উৎপত্তি বিকারমূলক, তাহা হইতে অমৃত ফল উৎপন্ন হইবে, ইহা কি সম্ভব? ভাল সামগ্রীকে বিকৃত করায় যাহার উৎপত্তি হইল, তাহার ফল সুফলপ্রদ হইবে, একথা স্বভাবতঃ কাহারও মনে হয় না। ইহা যে বিষবৎ পরিত্যাজ্য তাহা আর বলিবার আবশ্যক করে না। যেমন প্রত্যেক বস্তুতে উত্তাপ গূঢ়ভাবে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে,—মাদকতা যেমন প্রত্যেক বস্তু মাত্রেই আছে,—তেমনই বিষয় সমূহেও স্থিতি করে। বিষয়সম্ভূত যে মাদক, তাহার কথা বলি। যেমন অহিফেন, গাঁজা, সুরা প্রভৃতি উত্তেজক, তেমনই বিদ্যোপার্জ্জন, সৎকার্য্যানুষ্ঠান ও ধর্ম্মসাধনেও একরূপ বিশেষ গূঢ় মাদকতা আছে, অথচ ইহা প্রথমোক্ত মাদকতার ন্যায় অনিষ্ট উৎপাদক হয় না। ইহাতে অর্থনাশ, মনস্তাপ, স্বাস্থ্যভগ্ন হয় না, বরং তাহা চির-উন্নতির সহায় হয়, এবং চির-কল্যাণ দান করে। ইহাতে তাহার ইহকাল, পরকাল, চিরকাল রক্ষা করে। এই জন্য আমাদের অনুরোধ, হে ভাই সকল! জ্ঞানোপার্জ্জনরূপ মাদক সেবন কর। দেশ ও লোক-হিতকর কার্য্যের নেশায় মত্ত হও। যে সুরাপানকে লোকে শ্রেষ্ঠ নেশা মনে করে, যাহা পান করিলে মনুষ্যকে মাতোয়ারা করে, সেই সুরা যদি পান করিতে চাও, তবে "হরি"-নাম-সুরা, ইচ্ছানুযায়ী যত পার পান কর, ইহাতে মানুষ মরে না, বরং অমৃত লাভ করিয়া অমর হয়। সমুদ্র মন্থন করিয়া দেবগণ অমৃত লাভ করেন। সেই অমৃত পান করিয়া অসুরদিগকে জয় করিয়া তাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত

ন। সেইরূপ হরিনামরূপ অনন্ত সাগর যতই মন্থন করিবে, ততই সুধা লাভ করিতে পারিবে এবং সেই সুধা বাধে পান করিয়া অসুর-বিনাশপূর্ব্বক শান্তির মধুর ইল্লোলে চিরসুখী হইতে পারিবে। অতএব এমন যে অমূল্য সুধা, ইহা যতই পান করিতে থাকিবে, ততই অমৃতত্ব লাভ করিয়া মৃত্যুর যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবে।

স্ত্রীর ক্ষমতা।

স্ত্রীজাতি দুর্ব্বল, এই সাধারণ উক্তি; কিন্তু তাই বলিয়া য তাহাদিগের কোন আধিপত্য বা ক্ষমতা নাই, ইহা মনে রা নিতান্ত ভ্রান্তি। আমরা ইতিহাস পাঠে স্ত্রীচরিত্রের ত মহত্ত্বের পরিচয় পাই। স্ত্রী প্রকৃতি কোমল; কিন্তু কামলতা দুর্ব্বলতার পরিচায়ক, এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রান্তি-লক। জল কোমল; কিন্তু জলের প্রবল পরাক্রম আমরা ক সময়ে সময়ে নিরীক্ষণ করি না? বেগবতী স্রোতস্বতীর প্রবল তরঙ্গের নিকট সুদৃঢ় শৈলরাজী কি পরাস্ত হয় না? াষ্পের পরাক্রম আমরা কি অবগত নহি? প্রস্তর বা ইষ্টক ঠিন, কিন্তু শুধু কি তাহাই গৃহনির্ম্মাণের একমাত্র উপ-করণ? যেমন তরল সুরকি বা মসলা ইষ্টক সংযোগে গৃহ-াচীর সুদৃঢ় হয়, অন্যথা উভয়ই যেমন অকর্ম্মণ্য, তদ্রূপ ীও পুরুষ প্রকৃতির সংযোগে প্রকৃত চরিত্র সংগঠিত হয়। ামরা স্থির শান্তভাবে আমাদের নিত্য পারিবারিক জীব-নের ঘটনাবলী নিরীক্ষণ করিলে, এ সত্য সচরাচর প্রতিপন্ন

হইতেছে দেখিতে পাই। আড়ম্বরপূর্ণ বজ্রের ভীম নিনাদ-শক্তির পরিচায়ক বটে, কিন্তু নিস্তব্ধ নিভৃত মাধ্যাকর্ষণে কি শক্তির ক্রিয়া আমরা উপলব্ধি করি না? পুরুষ-শক্তি আড়ম্বর পূর্ণ; কিন্তু স্ত্রীশক্তি নিস্তব্ধভাবে হৃদয়কে অধিকার ও শাসন করে। এজন্য সাধারণতঃ স্ত্রী পুরুষের কার্য্য-ভূমি স্বতন্ত্র দেখা যায়। পুরুষের বীরত্ব ও আধিপত্য যেমন কার্য্য ও স্থল বিশেষে প্রকাশিত হয়। স্ত্রীর আধিপত্য ও ক্ষমতা কি তেমনই সময় ও স্থান বিশেষে প্রতিষ্ঠিত নহে? তিনি গৃহদেবী কর্ত্তৃ লক্ষ্মী, এই সকল উক্তির দ্বারা কেমন উপযুক্ত স্থনে বরণীয় হইয়াছেন। আমরা এজন্য উভয়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি। বড় ছোট প্রভেদ জ্ঞান কেবল অভিমান প্রসব করে, কিন্তু উভয়ের প্রয়োজনীয়তাকে সমাদর করিলে, আত্মাভিমান সংযত হইয়া সদ্ভাব বিস্তার করে, বৃথা অহঙ্কারে স্ফীত হইবার অবকাশ পায় না। আমাদের দেশের পুরাকালের সতী সাধ্বীদিগের চরিত্র আলোচনা করিলে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের শিক্ষা ও ব্যবহার কত সন্তানের ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের কারণ হইয়াছিল। তাঁহারা বীর সন্তান প্রসব করিয়া বীর-প্রসবিনী বলিয়া খ্যাতা হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সভ্য সমাজেও এ সত্যের মহিমা আদৃত হইতেছে। মাতার সদ্‌গুণ ও সচ্চরিত্রতা প্রযুক্ত কত সন্তানের জীবন যে অত্যাশ্চর্য্য সুন্দর পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছে, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তও বিরল নহে। অতএব ছোট বড় এই অভি-মান-সম্ভূত বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া পরস্পরের অধিকার

শক্তি ও ক্ষমতা স্বীকার করিয়া, এবং পরস্পরের নির্দ্দিষ্ট অধিকার ও ক্ষমতা অনুসারে কর্ত্তব্য পালন করাই মনুষ্য জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য। আত্মজ্ঞান লাভ কর, এবং স্ব স্ব অধিকার ভূমিতে বিচরণ কর; তাহা হইলে পরস্পরে পরস্পরের সহায়, সখা-সখী, এই ঈশ্বর-দত্ত সম্বন্ধ বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিবে। এই সম্বন্ধ জ্ঞান বিকশিত হইলে বিবাদ বিসম্বাদের ভূমি স্পর্শ করিতে আর প্রবৃত্তি হইবে না; তখন উপযুক্ত বিনয়-ভূষণে ভূষিত হইয়া পরস্পরের ক্ষমতা, মান্য ও স্বীকার করিতে শিখিবে; সুতরাং কর্ত্তব্য-সাধনের গুরুভার অবগত হইয়া কেবল গুণ গ্রহণে, ও যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা প্রদানে পরম-সুখ-শান্তিতে কালাতিপাত করিতে পারিবে। মনুষ্য মাত্রেরই দুর্ব্বলতা আছে, এই দুর্ব্বলতা সত্বেও তাহার ক্ষমতাও বিলক্ষণ আছে। তাই নরনারীর দুর্ব্বলতার মধ্যে ক্ষমতা উপলব্ধি করিয়া উভয়কেই যেন আমরা আদর করিতে শিখি।

আমোদ-সম্ভোগ।

পরিশ্রম ও বিশ্রাম যেমন আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কর্ম্মকার্য্য যেমন জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক, আমোদ প্রমোদ তদ্রূপ আমাদের জীবনের সামান্য কর্ত্তব্য নহে। অন্ন-পান, স্নান-ভোজন, যেমন শরীরের পুষ্টিসাধনের উপায়, আমোদ তেমনি শরীর-মনের স্ফূর্ত্তি ও প্রফুল্লতা বিধানের সহায়। ক্রমাগত পরিশ্রম করিলে, শরীর মন অবসাদগ্রস্ত হয়, সেই অবসাদ একটী বিশেষ উপায়। প্রকৃতভাবে

দেখিলে আমোদ সম্ভোগ একটী পবিত্র ও স্বর্গীয় ব্যাপার। আমরা এই জানি যে, কোন বস্তু বা বিষয় আদৌ অপবিত্র নহে, কেবল তাহার ব্যবহারের ব্যতিক্রমই, ফলের ব্যতিক্রম ঘটায়; এবং তদ্ধেতু বস্তু বা বিষয় বিকৃত হইয়া পড়ে। নতুবা আমরা যদি সমুদায় বিষয় প্রকৃতরূপে ব্যবহার করি, তাহা হইলে সুখকর ফল লাভ করি, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। নিগূঢ় কথা এই যে, আমোদ-সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইয়া মনুষ্য উদ্দেশ্য ভুলিয়া আমোদের অসদ্ব্যবহারে ঢলিয়া পড়ে, সেই জন্যই সে আপনার উপরি আমোদপ্রমোদ উপলক্ষে সর্ব্বনাশের উৎপাত আনিয়া উপস্থিত করে। প্রকৃত কথা এই যে, যেখানে আমোদ বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার গণ্ডী অতিক্রম করে, সেই স্থানে তাহার বিষময় ফল ফলিত হয়। নতুবা আমোদ যখন পবিত্র ভাবসঙ্গত সীমার মধ্যে স্থিতি করে, তখন তাহা কেবল শরীরের অবসন্নতা, মনের বিষণ্ণতা বিদূরিত করিয়া দিয়া শরীর মনকে প্রফুল্লভাব প্রদান করে। অতএব যে বস্তু প্রফুল্লতা প্রসব করে, তাহা যে পরিহার্য্য, বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্য তাহা কিরূপে স্বীকার করিবে? আমোদ যখন নিয়মাধীন, পবিত্রতাসম্ভূত ও সুরুচি-সংশ্লিষ্ট, তখন তাহা দেবতার প্রসাদসদৃশ আমাদিগকে অনেক সুখ শান্তি বিধান করে। পবিত্র ধর্ম্মসঙ্গত আমোদই মঙ্গলময় বিধাতার অভিপ্রেত।

ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, স্নান ভোজনের ন্যায় আমোদ আমাদের প্রকৃতিমূলক। প্রকৃতির ভিতরে অভাব অনুভূত হইল, তাহা হইতে বাহিরে আয়োজনের আবশ্যক হইল।

এই আয়োজন—উপকরণের স্থলে জ্ঞান বিজ্ঞানের তারতম্য হেতু ফলের তারতম্য হইয়া পড়ে। যে মনুষ্য বা যে জাতি যত বিচক্ষণতা সহকারে অভাব মোচনের সদুপায় নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়, সেই মনুষ্য বা সেই জাতি ততই সুফল লাভ করিয়া সুখী ও সভ্য বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে।

মনুষ্য ক্লান্ত শ্রান্ত হইলে বিশ্রাম ও আমোদের প্রত্যাশী হয়, এবং এই বিশ্রাম ও আমোদের কালে স্বভাবতঃই তাহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত শিথিল হয়। ইহা স্বাভাবিক, যে শিথিল অবস্থা অসতর্কতা প্রসব করে। সুতরাং আমোদের স্থলে যা বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ রূপে সতর্কতা ও বিচক্ষণতা অবলম্বন করা অতীব আবশ্যক। কি জানি কোন গুপ্ত বা ছদ্মবেশধারী প্রাণবিনাশকারী প্রাণ সংহারে উদ্যত হয়, এজন্য আত্মরক্ষার্থে সময় ও অবস্থা বিশেষে প্রহরীর প্রয়োজন হয়। সেই রূপ পাছে আমোদ প্রমোদের শিথিল অবস্থাতে কোন প্রকারে কোন কলুষিত বিষয় মনকে বিকৃত অথবা তদুপরি কোন আধিপত্য স্থাপন করে, এজন্য আমোদের উপাদান—উপকরণ যথাসম্ভব বিশুদ্ধ ভাবোদ্দীপক ও পবিত্রতামূলক হওয়া একান্ত বিধেয়। যেমন জলের আলবাল দ্বারা জল রাখা অসম্ভব, এজন্য মৃত্তিকার অথবা অন্য কোন দৃঢ় পদার্থের আলবালের আবশ্যক। তদ্রূপ আমোদ সদৃশ কোমল বিষয়টীকে ঠিক ওজন মত ও বিশুদ্ধ ভাবগত করিতে হইলে পুণ্যের কঠিন গণ্ডী দ্বারা তাহাকে অতি যত্নে রাখিতে হইবে। লজ্জাবতী-লতা যেমন স্পর্শ মাত্র সঙ্কুচিত হয়, মনের বিশুদ্ধ কোমল আমোদ স্পৃহা সেই

রূপ পাপের ভ্রুকুটীপাতে অথবা কলঙ্কভাব-স্পর্শে কলুষিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আমোদ-স্থলে এক মলিন কটাক্ষ-পাতে কত যুবার চরিত্র নাশ—যেন মুণ্ডপাত হইয়াছে, তাহা কে না জানেন? এজন্য আমোদ সম্ভোগের বিষয়কে পুণ্যের কঠিন আবরণে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বিন্দু প্রমাণ মলিন ভাব তাহাতে সংযুক্ত না হইতে দেওয়া একান্তই আবশ্যক; কেননা অণুমাত্র অপবিত্র ভাবই সর্ব্বনাশের হেতু। দুগ্ধপূর্ণ কুম্ভে বিন্দুসম গোমূত্র স্পর্শিত হইলে, যে বিষময় ফল উৎপাদন করে, আমোদপ্রমোদের বিষয়ে অপবিত্র উপাদানের সংস্রব থাকিলে, সেইরূপ বিষম অনিষ্ট-কর ফল ফলিবে, তাহা চিন্তাশীল বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ সহজেই যে স্বীকার করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এ বিষয়ে, ঘটনা ও সামাজিক কার্য্য-কলাপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে। যে সমাজে সন্নীতি-পরিপোষক ও সদ্ভাবোদ্দীপক আমোদ প্রচলিত, সেই সমাজ প্রকৃত সভ্যসমাজ বলিয়া পরিগণিত। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের জাতীয় পদ্ধতির মধ্যে বিজাতীয় ভাব-প্লাবন প্রবেশ করিয়া সমুদয় বিষয়টাকে যেন উলট্‌পালট্‌ করিয়া ফেলিয়াছে, এবং এই বিপ্লবে পড়িয়া, সকলে যেন আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে। তাই আমাদের মধ্যে অনুকরণ-প্রবৃত্তি এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সে যাই হউক না কেন, আজ কাল আমোদপ্রমোদের যে সব উপায় অবলম্বন করা হইতেছে, তাহা সভ্যতার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া দেশে কুরুচির স্রোত প্রবাহিত করিতেছে। যে নাটকের উদ্দেশ্য, সামাজিক কুরীতি কুনীতি বিশদরূপে

আলোচনা করা, ও তাহার বিষময় ফল হইতে সকলকে সতর্ক করা,—যে অভিনয়ের উদ্দেশ্য সামাজিক অসদনুষ্ঠানকে দলন করা, সে সব করা দূরে থাকুক—রাশি রাশি নাটক বিরচিত হইয়া বহুল নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়া, কেবল কুরীতির প্রশ্রয় দিতেছে,—অসদুপায়ে অর্থাগমের পথ প্রস্তুত করা হইতেছে, এবং সমাজ মধ্যে এক নূতন রকমের কুরুচির প্রবাহ প্রবাহিত করা হইতেছে; নূতন ধরণের অত্যাচার ব্যভিচার—সভ্যতার সাজে সজ্জিত করিয়া অসতর্ক অনভিজ্ঞ লোকদিগের—বিশেষতঃ কোমল-সরল-হৃদয় যুবকবৃন্দের মনকে তাহাতে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের অত্যন্ত অনিষ্ট উৎপাদন করা হইতেছে। তাই আমরা অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক অনুরোধ করি, যে আমোদপ্রমোদে অপবিত্রতার সংস্রব আছে, দেশের মঙ্গলার্থে ধনীরা তাহাতে যেন সহায়তা না করেন, বিদ্বানেরা যেন তাহার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখেন। বরং যাহাতে সুরুচিসঙ্গত বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ দেশে প্রচলিত হইয়া দেশের নিত্য কল্যাণ বর্দ্ধন করে, সকলের নীতি ও রুচিকে বিশুদ্ধভাবাপন্ন করিয়া প্রকৃত সভ্যতা ও ভদ্রতার স্রোত প্রবাহিত করিয়া সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করে, দেশীয় সকল লোক আবাল বৃদ্ধ জ্ঞানী ধনী মানী সকলের এই দিকে দৃষ্টি ও যত্ন ধাবিত হউক, এই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। আর বারাঙ্গনা-সংশ্লিষ্ট আমোদ-প্রমোদে অনুরাগী হইবার সুযোগ না পান; ইহাই আমাদের সকলের নিকট প্রার্থনা। এ প্রার্থনা কেহ কি পূর্ণ করিবেন না?

তীর্থ।

তীর্থ পর্য্যটন জ্ঞান লাভের একটী প্রশস্ত উপায়। কিন্তু যে ভাবে সচরাচর তীর্থ পর্য্যটন আজ কাল হইয়া থাকে, তাহাতে সে ভাব যে আদৌ সংসিদ্ধ হয় না, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জ্ঞানাঞ্জনশোভিত চক্ষুদ্বারা তীর্থ দর্শন আবশ্যক, নতুবা তাহা পণ্ডশ্রম; এবং অজ্ঞানতা বৃদ্ধি ও কুসংস্কার বদ্ধমূল করিবার উপায় মাত্র। বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা লাভ হয়,—শাস্ত্র পাঠে সে সত্য উপলব্ধি হয়, তীর্থ ভ্রমণ ও ও দর্শনে সে জ্ঞান পরিপক্ব হইবে, ইহাই তীর্থ পর্য্যটনের বিশেষ উদ্দেশ্য। যে সকল লোক তীর্থদর্শনাভিলাষী, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অন্ধ-বিশ্বাস-বিশিষ্ট অবলা সরলা কুলবালা। পক্ষান্তরে তীর্থগামী পুরুষ মাত্রই প্রায় সকলেই দিব্য-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত ও প্রচলিত প্রথার আশ্রিত ভৃত্য। সুতরাং এ সকল লোক যে তীর্থের প্রকৃত ভাবার্থ গ্রহণ করিতে অক্ষম, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ তীর্থের অর্থ গভীর, ইহা ভাবুক বা সাধক ভিন্ন কে বুঝিবে? দর্শন—শ্রবণ-লব্ধ-জ্ঞানকে পরিপক্ব করে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং শাস্ত্রপাঠ বা শ্রবণ করিয়া যে জ্ঞান আমরা লাভ করি, তাহা বিবিধ দেশ ভ্রমণ, তীর্থ পর্য্যটন. বিভিন্ন জাতীয় আচার-পদ্ধতি পর্য্যাবলোকন ও বিবিধ পীঠস্থান পরিদর্শন দ্বারা যে বিস্তৃত, বিকশিত ও সংসিদ্ধ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা আমাদের নিজ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা এই সত্য বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিতে পারি, যে উল্লিখিত উপায় দ্বারা মনের ঔদার্য্য,

সারল্য প্রভৃতি গুণ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। শৈল-রাজির মহত্ত্ব ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া কোন মনে না স্বভাবের ঔদার্য্য ভাব উদ্ভাবিত হয়? অসীম সাগরের সমাগমে কাহার প্রাণে না অনন্ত-ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া সমু-দায় ক্ষুদ্রতা—সঙ্কীর্ণতাকে বিলীন করিয়া দেয়? এই সকল ভাব আমাদের প্রাণে সঞ্চারিত করিবার সহজ উপায় স্বরূপ তীর্থ পর্য্যটন—দেশ ভ্রমণ রীতি আমাদের দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন শাস্ত্রকারেরা বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে সকল মহৎ অভিসন্ধি উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে তীর্থ-পর্য্যটনের সদ্ব্যবহার করিয়া আমাদের জীবনকে সারবান্ করিব, এ সংকল্প করিয়া আজ কাল কয় জন লোক তীর্থগমন করেন? অনেকেই প্রথা ও আচার-ব্যবহার বা সংস্কারের দাস হইয়া কার্য্য করিয়া নানা অত্যা-চার, অনাচার, এমন কি ব্যভিচার পর্য্যন্তও সমুপস্থিত করেন। প্রকৃত কথা এই যে, যতদিন আমাদিগের দেশস্থ লোকেরা অসার লৌকিকতা ও অকিঞ্চিৎকর প্রচলিত প্রথার দাসত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞান বিচার ও যুক্তি সহকারে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম পরিজ্ঞাত না হইবেন, এবং তদনুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠান না করিবেন, ততদিন আমাদের প্রকৃত উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

উপদেশ,—বলিদান।

বলিদান ভিন্ন পূজা সিদ্ধ হয় না, এই জন্য দেখা যায়, সকল দেশে সকল কালে সকল সম্প্রদায় মধ্যে কোন না

কোন প্রকারে বলিদান পূজার অঙ্গরূপে আবহমানকাল প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যেমন পূজার বিধি, তদ্রূপ বলিদানের ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়া থাকে। আড়ম্বর-পূর্ণ বাহ্য পূজায় বলিদানের উপকরণ স্থূল আকার ধারণ করে, এজন্য রাজসিক ও তামসিক পূজায় বলিদানের উপাদান ছাগ মহিষাদি নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি বিশেষ হিংস্রক জন্তুদিগকে বলিদানের বিষয় না করিয়া গৃহপালিত অপেক্ষাকৃত শান্ত ও নির্দ্দোষ-স্বভাব পশু বধের বিধি কেন হইল? ইহার গূঢ় অর্থ এইরূপ বোধ হয় যে, প্রকাশ্য শত্রু বধ্য, ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত, ও সকলেই ইহার জন্য সহজেই প্রস্তুত। কিন্তু আপাততঃ নিরীহ ছদ্মবেশ ধারী প্রচ্ছন্ন শত্রুকে দলন না করিলে সর্ব্ববিঘ্ন দূর হয় না,—এজন্য পালিত প্রিয় পশু যাহা প্রচ্ছন্ন রিপুর অবতার সদৃশ তাহাকে বলিদানপূর্ব্বক মোহ ও মায়ামুক্ত না হইলে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। আমরা নিরাকারবাদী বাহ্যউপকরণের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। তথাপি বলিদানের উপকারিতা স্বীকার করি, এবং ব্রহ্ম বলিদানের ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া পূজার আয়োজন করিব। কাম ক্রোধাদি সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশুর মত সর্ব্বজনবিদিত প্রকাশ্য রিপু; ইহাদিগকে শাসন করিতেই হইবে, ইহা ত ধর্ম্মশাস্ত্রের আদি অক্ষর; কিন্তু অহঙ্কার, আত্মাভিমান, আসক্তি প্রভৃতি যে প্রচ্ছন্ন রিপু সকল,—যাহারা ধর্ম্মের কপট বেশ ধারণ পূর্ব্বক প্রচ্ছন্ন ভাবে হৃদয় মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, তাহাদিগকে সংযত না করিলে পরিত্রাণ অসম্ভব। এজন্য আমাদের

বলিদান বাহ্য ব্যাপার অথবা বাহ্যাড়ম্বর নহে ;—রক্তারক্তির বিষয় নহে। আমাদের দেবতা নিরাকার, বলিদানও নিরাকার। ছদ্মবেশধারী হৃদিস্থিত আসক্তি সমূহকে বলিদান দিয়া পশুর উপদ্রব নাশ করিয়া মনের শান্ত ভাব সংস্থাপন কর ; পূজা সহজ ও স্বাভাবিক হইবে। নতুবা পূজা কেবল বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। তাহাতে সুখ শান্তির আশা বিড়ম্বনা মাত্র। এই প্রচ্ছন্ন রিপু সকল সংযত না হওয়াতে আমাদের জীবনে ধর্ম্ম প্রকৃত রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না। কত ব্রাহ্ম উৎসবে মুগ্ধ হইল,—কত কীর্ত্তনে মাতিল, আবার কিছুদিন পরে সংশয় ও অবিশ্বাসের সাগরে ডুবিয়া মরিল। গুপ্তচর যেমন তরণীকে জল মগ্ন করে, গুপ্ত পাপ তেমনি আত্মাকে বিনাশ করে।

উপদেশ,—প্রায়শ্চিত্ত।

বলিদান ব্যতীত যেমন পূজা সিদ্ধ হয় না, প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন তেমনি পূজায় অধিকার জন্মে না। পুরাতন মলিন বেশে কি পূজা হয়? যাহারা বাহ্য উপকরণ পূজার অঙ্গ মনে করে, তাহারাও স্নান দ্বারা মলিনতা প্রক্ষালন পূর্ব্বক নূতন শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া পূজা আরম্ভ করিয়া থাকে, বাহ্য শুদ্ধতা আমাদের একমাত্র উপকরণ নহে আত্মার শুদ্ধতা আমাদের পূজার বিশেষ প্রয়োজন। সেইজন্য পূর্ব্বকৃত পাপ, মলিনতা হইতে হৃদয়কে অনুতাপের জলে ধৌত করিতে হইবে ; পুণ্য-বসন পরিধান পূর্ব্বক শুদ্ধাত্মা হইতে হইবে ; কেননা মলিন বেশে পূজা নিষ্ফল। উৎসবে নূতন বস্ত্র

পরিধান পূর্ব্বক বিবিধ রঙ্গরসে শরীরকে অনুরঞ্জিত করা পুরাতন বিধি। নূতন বিধানে অন্তর বাহির সমস্ত শুদ্ধ ও নূতন বেশ ভূষায় সুশোভিত করিতে হইবে; তবে পূজার অধিকারী হইতে পারিবে। তাই নূতন বস্ত্র ভিক্ষা কর; নূতন বেশ ধারণ কর, এবং এই রূপে প্রস্তুত হইয়া দেব সমীপে উপস্থিত হও, পূজায় সফলকাম হইবে।

ব্রহ্মমন্দির, দীপ্তশিরা পাপানলে-দগ্ধ-প্রাণ পাপীর আশ্রয় স্থান; এবং উৎসব ব্যাকুলচিত্ত পাপত্রাণাকাঙ্ক্ষীর পরিত্রাণের উপায়। তাই ব্রহ্মোৎসব পাপীর আশা ও আনন্দের ব্যাপার। ধর্ম্মাভিমানী সাধুদিগকে লইয়া উৎসব সম্পন্ন হইবে, সে জন্য অধম-তারণ পতিত-পাবন দীনশরণ শ্রীহরি এই উৎসব মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা নহে। ইহা কেবল যদি সাধুদিগের জন্য হইত, তবে আমরা এখানে আসিতে পারিতাম না। অহঙ্কারী পাপীর এখানে প্রবেশাধিকার নাই। ধার্ম্মিকবেশধারী পুণ্যাভিমানী এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না। কেবল অনুতপ্ত ব্যাকুলচিত্ত পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী দীনাত্মা পাপীদের জন্য পতিতপাবন শ্রীহরি ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া এই উৎসব মন্দিরে উপস্থিত। অনুতাপই পাপের যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত। এই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মোৎসব ক্ষেত্রে সমবেত হও। আকুল চিত্তে ও কাতর প্রাণে বিনীত হইয়া উৎসবে যাহারা আসিবে, তাহারাই ধন্য হইবে।

নবকুমারের জন্মোপলক্ষে উপদেশ।

বন্ধুগণ! আজ আমরা এই ব্রহ্মমন্দিরে কেন সমাগত হইলাম, ইহা বোধ করি সকলেই অবগত আছেন। অদ্য নবকুমারের জন্মোপলক্ষে,—একটী স্বর্গের দূত মর্ত্ত্যে আগমন করিল বলিয়া, মঙ্গলদাতা বিধাতাকে কি কৃতজ্ঞতা-উপহার দিতে আমরা এখানে আসি নাই? বন্ধুগণ! এই শুভ ঘটনা কেমন অলৌকিক, কেমন আশ্চর্য্য, তাহা স্মরণ কর। এই ঘটনা-তত্ত্ব অধ্যয়ন কর; বেদ বেদান্ত ইহার ভিতর নিহিত দেখিতে পাইবে। একটী সন্তান জন্মিলে, কি ধনী, কি নির্ধন, সকলের অন্তরে, সকলের গৃহে, সঙ্গতি অনুসারে আনন্দোৎসবের ব্যাপার আরম্ভ হয়। এই আশ্চর্য্য ঘটনা যেন সকলের আলস্য—অচৈতন্য দূর করিল; এবং মনুষ্য-সমাজকে যেন আন্দোলিত করিল। মঙ্গলময় বিধাতা ঘটনার ভিতর দিয়া কত শিক্ষা দেন, তাহা যদি ভাবি, তবে আর কি জড়ের মত জড়ীভূত—মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে পারি? ঘটনার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ঘটনার আকরে উপনীত হইয়া অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হই। দেখ বন্ধুগণ! ভগবান ঘটনার ভিতর দিয়া কেমন কথা কহিতেছেন, কেমন আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। একবার বিশেষ ভাবে তাহা দেখ, তাহা শুন। এই নব শিশু জন্মগ্রহণ করিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার হইল না?

এই উপস্থিত ব্যাপার কি উন্নতির—বৃদ্ধির পরিচায়ক নহে? এই বংশ-বৃদ্ধি কি বৃদ্ধির কারণকে স্মরণ করাই-

তেছে না? ইহাতে কি মনে হয় না যে, সেই জন্মদাতা বিধাতা জাগ্রত জীবন্ত দেবতা হইয়া এই সকল ঘটনা সংঘটন করিতেছেন? বন্ধুগণ! দেখ, মর্ত্ত্যের রঙ্গভূমিতে কি আশ্চর্য্য রূপে এক নূতন অভিনয় হইল, দেব অংশ ভগবৎ-খণ্ড অবতীর্ণ হইল। এই ভাবে যতই আমরা এই জন্ম-ব্যাপার উপলব্ধি করিব, ততই ইহার ভিতর হরিলীলা দেখিয়া আমাদিগের পুণ্য বৃদ্ধি করিব, নতুবা মায়া-বৃদ্ধি অনিবার্য্য। পৃথিবীর লোকেরা ভগবানের ঘটনা-শাস্ত্রের প্রকৃত ভাব অবধারণ না করিয়া মায়ায় ডোবে,—ভগবানকে ভোলে। কিন্তু উপস্থিত ব্যাপার শুভ ব্যাপার, ইহা স্মরণ করিয়া এস আমরা সব নরনারী জয়ধ্বনি—শঙ্খধ্বনি করি। ভক্তগণ শিশু-মাহাত্ম্যের বিশেষ মর্য্যাদা করিয়াছেন। এই জন্য শিশু অতি আদরের ধন, শিশু দেবখণ্ড বলিয়া, বোধ হয়, প্রসূতি সন্তান প্রসব করিলে এদেশের লোকেরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া থাকে।

শিশু কথা কহিল না, অথচ কেমন আশ্চর্য্য ভাবে পরিবার বর্গের মন আকর্ষণ করিল। শিশু কোথায় ছিল, ঘোর অন্ধকারের ভিতর হইতে কেমন লাবণ্য ধারণ পূর্ব্বক প্রকাশিত হইল। ইহা ভাব, ইহা দেখ। এই জন্মের ভিতর এক প্রকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড নিহিত আছে। যত সে জ্ঞান প্রকাশিত হইবে, বহুদিনের পুরাতন জড়তা—অনেক দিনের গূঢ় সংশয় ও নাস্তিকতা চূর্ণ হইবে। স্বর্গের শিশুকে দেখ, আর যোগ বৈরাগ্য সরলতা শিক্ষা কর, কেননা শিশু স্বর্গের দূত রূপে আপনার ব্যবহারে এই সকল স্বর্গের সুসমা-

ার সকলকে প্রদান করিতেছে। শিশুকে দেখিয়া—শিশুর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া এই সকল ভাব যদি প্রাণে পুনরুদ্দীপিত হয়, তবেই তো অদ্যকার আনন্দ প্রকৃত আনন্দ হইবে, অদ্যকার উৎসব শূন্য আড়ম্বরে পরিণত হইবে না; শিশু স্বর্গের দূত বলিয়া এই সকল অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার যথোচিত সমাদর করা হইবে। এই সন্তানকে স্পর্শ করি, দর্শন করি,—করিয়া আমাদের পুরাতন স্বভাবকে নূতন করি। দেখ, যেন আমাদের মলিন ভাব তাহার উপর ঢালিয়া দিয়া তাহাকে যেন আমাদের মলিন দলভুক্ত করিয়া না লই, তাহাতে আরো অপরাধ বাড়িবে। এই নব শিশু স্বর্গের দূত হইয়া, আমাদের জন্ম, আমাদের বংশ স্মরণ করাইয়া দিতেছে,—এবং বলিতেছে, শিশুর জন্ম-বৃত্তান্তের সঙ্গে আমাদের জন্ম-বৃত্তান্ত কেমন মিলিত। শিশু যেরূপে জন্ম গ্রহণ করিল, আমরা সেই রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। যেখান হইতে শিশু আসিল, আমরা সেই স্থান হইতে আসিয়াছি, ও সেই স্থানে আবার এখানকার কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া যাইব। যে মোহ মায়া এই ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, আজ এই শুভ ঘটনার আন্দোলনে তাহা অপসারিত করিল। বন্ধুগণ, সংসারধাম পান্থধাম ইহা কি আজ হৃদয়াঙ্গম হইল না? কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই কুচবিহারকে বিদেশ জ্ঞান করিয়া কেহ কি কার্য্য করিতেছেন না? এবং স্বদেশ হইতে কোন নবাগত বন্ধু আসিলে তিনি ব্যাকুল হইয়া তাহার নিকট দেশের সংবাদ ও অবস্থা জানিতে ও তথাকার আত্মীয় জনগণের তত্ত্ব লইতে কি কৌতূহলাক্রান্ত হন না? যার

তাহা না হয় তাঁহার স্বদেশানুরাগ হ্রাস হইয়াছে, ইহা কি স্থির-নিশ্চয় নহে? তবে চল, শিশুর নিকটে গিয়া স্বদেশের তত্ত্ব অবগত হইয়া সেই দিকে অনুরাগ উদ্দীপিত করি, কেননা বংশানুরাগ আমাদিগকে সংসারের মোহ মায়া হইতে মুক্ত করিবে। এই রূপে বিদেশের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমরা স্বদেশের আত্মীয়বর্গের সহিত চৈতন্য-যোগে মিলিত হইব, তথায় আর্য্যকুল-তিলক ভক্তবৃন্দসহ প্রাণ-যোগে যুক্ত হইয়া ভক্তচিত্ত-বিনোদন ও ভক্তবৎসল শ্রীহরির প্রসাদে শুদ্ধ ও সুখী হইব। ভগবান এই শুভ ঘটনা যোগে আমাদিগকে সুশিক্ষা দিন। আর এই শুভযোগ স্মরণ করিয়া নবকুমারের জন্য শুভ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি, ও মঙ্গল দাতা বিধাতাকে কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে ধন্যবাদ দিয়া কৃতার্থ হই।

সুনীতি-সুকথা।

১। সর্ব্ব গুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুণ—সুনীতি, এবং সকল কথা অপেক্ষা সুমিষ্ট সত্য কথাই—সুকথা।

২। সৎ চিন্তা ও সৎকার্য্যের সম্মিলনই সাধুতার লক্ষণ।

৩। টাকা—টাকা—টাকা, বিষয়ীর মুখে নিয়তই এই কথা; হরি হরি হরি ভক্তের মুখে সততই এই নাম, সংক্ষেপে ভক্ত ও অভক্ত এই লক্ষণে পরিচিত হয়।

৪। বন-গমন বিরক্ত বৈরাগ্যের লক্ষণ, মন-গমন প্রকৃত বৈরাগ্যের সাধন।

৫। শুঁড়ীর সুরায় পশুত্বের উৎপত্তি, হরিসুরায় দেবত্ব

প্রাপ্তি ; সংক্ষেপে মাদক-তত্ত্বের ফলাফল নির্দ্ধারণের ইহাই সহজ উপায়।

৬। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ অবহেলা করিবেক না ; কেননা লঘুর সমষ্টিতে গুরুর উৎপত্তি।

৭। জীবনের সকল কার্য্য সত্যেতে নিয়োগ কর ; অসত্য ও স্বচ্ছন্দ অভ্যাস আপনা আপনিই দূর হইবে।

৮। জীবনের অনিত্যতা চিন্তা কর ; অসার আমোদ প্রমোদের প্রবাহ আপনি নিস্তেজ হইবে।

৯। আলস্য সকল অনিষ্টের মূল, অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে ইহা পরিত্যাগ করিবে ; ও সর্ব্বদা কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিবেক।

১০। বিবেক ও কর্ত্তব্য জ্ঞানকে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিবে, নতুবা প্রবৃত্তির দৌরাত্ম্যে তুমি নিজ কর্ত্তৃত্ব হারাইবে।

১১। শরীরের বিকার রোগ, মনের বিকার পাপ, অতএব এই উভয়বিধ বিকার হইতে মুক্ত হইলে, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসুখ সহজ হইবে।

১২। পরিশুদ্ধতা দেবত্বের পরিচায়ক, অতএব সর্ব্বতোভাবে মনকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র রাখিবে।

১৩। মনের উৎকৃষ্ট ভাব জাগ্রত কর, নিকৃষ্ট কার্য্যসকল সহজেই রহিত হইবে।

১৪। বিশুদ্ধ সুখরসাস্বাদন করিলে, ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসা আপন হইতেই নির্ব্বাপিত হইবে।

১৫। রিপুই পরমশত্রু ;—রিপু হইতেই সমুদয় অনিষ্টের উৎপত্তি ; এজন্য রিপু সংযম নিতান্ত আবশ্যক।

১৬। রিপুসংযমেই ধর্ম্মের উৎপত্তি। যে হৃদয় রিপুর উত্তেজনায় উত্তেজিত, সেখানে নানা ভয়, সংশয় বিরাজমান, সুতরাং সে ব্যক্তির শান্তি কোথায়।

১৭। ইহা শাস্ত্রের উক্তি যে, বিক্ষিপ্ত চিত্ত-লোকের বুদ্ধি স্থির হয় না ; স্থির না হইলেও মনোভিনিবেশ হয় না, মনোভিনিবেশ না হইলে শান্তিলাভ হয় না, অশান্ত জনের সুখ কোথায় ?

১৮। প্রবৃত্তি পরতন্ত্র হইলে নিশ্চয় দোষ উৎপন্ন হয় ;— কিন্তু তাহাদিগকে বশীভূত করিলে সিদ্ধি লাভ হয়।

১৯। ঘৃতাহুতি যেমন অগ্নির প্রভাব বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ কাম্যবস্তুর উপভোগে কামনার বৃদ্ধি বই নিবৃত্তি হয় না।

২০। ভগবান সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি আমাদের মঙ্গলোদ্দেশ্যে প্রদান করিয়াছেন। সে সমুদায়ের সদ্ব্যবহারে সিদ্ধি লাভ, অসদ্ব্যবহারে অনিষ্টের উৎপত্তি হয়। যেমন অগ্নিসংযোগে ধাতুর মল ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের দোষ স্খলন এবং মনুষ্যের অমৃতত্ব লাভ হয়।

২১। সুখাদ্য খাও, স্বাস্থ্যরক্ষা সহজ হইবে। সচ্চিন্তা কর, শান্তি সম্ভোগ সুলভ হইবে। অতএব শরীর সম্বন্ধে অখাদ্য যেমন পরিত্যজ্য, মানসিক জ্বালা যন্ত্রণা, ভয় ভাবনা দূর করণার্থ অসার চিন্তা তদ্রূপ পরিহার্য্য।

২২। লঘু বস্তু চঞ্চল ; মহত্বের ভারিত্ব স্বাভাবিক। এই জন্য মহাজনদিগের মনের ভাব সাধারণ মনুষ্যের মত টলমল করে না। সংক্ষেপে মহত্তের এই লক্ষণ জানিবে।

২৩। চক্ষু খুলিলে যেমন জড়জগতের শোভা দেখিয়া সুখী

হইবে ; ভক্তিচক্ষু খোল, অন্তর-জগতে বিধাতার লীলা-ব্যাপার দেখিয়া মুগ্ধ হইবে। চক্ষু উন্মীলন না করিলে দর্শন অসম্ভব।

২৪। খেইহারা সূত্ররাশি যেমন অকর্ম্মণ্য, লক্ষ্যহারা জীবন তদ্রূপ, সুখের আড়ম্বর সত্ত্বেও সুখ-শান্তি-বিহীন। অতএব সাবধান! জীবনের লক্ষ্য হীন হইও না।

২৫। যদি কর্ত্তব্যপালনই জীবনের সারকার্য্য, তবে যেমন অপর সকলের প্রতি কর্ত্তব্যসাধন করিবে, তদ্রূপ ঈশ্বরের প্রতি নিত্য কর্ত্তব্য পালন করিবে ; কেননা ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য।

২৬। তুমি আপনাকে শিক্ষায় প্রবৃত্ত কর, ইহা তোমাকে সমধিক গৌরবান্বিত করিবে।

২৭। অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিও না ; যে পর্য্যন্ত বাঁচিবে, তাহা ভালরূপে কাটাইতে চেষ্টা কর।

২৮। যাহা তোমাকে লিপ্ত করে না, তাহাতে লিপ্ত হইও না।

২৯। এক মূহুর্ত্তও বৃথা নষ্ট করিও না, যেহেতু তোমার জীবনের এক ঘণ্টায় বিশ্বাস নাই।

৩০। জ্ঞান-সাগরে শফরী হইও না, রোহিত,কাতলা হও।

৩১। যত পার, জ্ঞানমহাসাগর হইতে অনুপম রত্ন সমূহ উঠাও। এসাগরে ডুবিবার আশঙ্কা নাই, কেননা ডুবিলেও লোক মরে না।

৩২। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এক পক্ষে, বিশ্বাসী একেলা এক পক্ষে শ্রেষ্ঠ। অতএব কাহাকেও অনাদর করিও না।

৩৩। ঈশ্বরকে ভয় কর; তিনি সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা।

৩৪। মানুষকে যখন ইহসংসারের সব একদিন ছাড়িতে হইবে, ইহা নিশ্চয় ;—তখন হে মানব! ভগবানেতে আত্ম-সমর্পণ কর, তুমি চিরসুখে সুখী হইবে।

৩৫। শত্রু তোমার মহানিষ্টের কারণ,—ইহা যদি তুমি মনে কর, তবে নিজ হৃদয়কে সংযত কর; যেহেতু মনুষ্য নিজেই অনেক সময় আপনার শত্রুতার কারণ হয়।

৩৬। কথা বলিবার অথবা কার্য্য করিবার পূর্ব্বে অল্পাধিক সতর্কতা অবলম্বন করিলে পরিণামে তজ্জন্য দুঃখিত হইতে হয় না। কারণ অসাবধানতা বশতঃ আমরা অনেক কথা বলি, ও অনেক কার্য্য করি, যাহা না বলা অথবা না করা উচিত ছিল।

৩৭। ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে পথ্যের ব্যবস্থা। ব্যবস্থা ব্যতীত রোগমুক্ত হওয়া অসম্ভব। কুপথ্য ঔষধের ফল বিফল করে। তদ্রূপ হরিনাম স্মরণ ও সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সত্যপালন দ্বারা মন ও চরিত্র-শুদ্ধির নিতান্ত প্রয়োজন। নতুবা কুপথ্যের ন্যায় কুচিন্তা ও কুকার্য্য হরিনাম-সাধনের বিঘ্ন ঘটায়, ও মনোবিকার বৃদ্ধি করে। তজ্জন্য সাধক মাত্রেরই সর্ব্বতোভাবে জীবন ও চরিত্র-শুদ্ধি নিতান্ত আবশ্যক।

৩৮। বিপদ যদি শিক্ষাগুরু হইয়া সম্পদদাতা বিধাতাকে স্মরণ করিয়া দেয়,—তবেই পরম লাভ, নতুবা উহা মহা বিষাদের কারণ। অতএব বিপদে ভগবানের অভয় পদ আশ্রয় করিয়া পরম সম্পদ লাভ করিবে।

৩৯। মনুষ্য-হৃদয় দেবাসুরের আবাস-ভূমি। যখন দেব-ভাবের জয়, তখনি মানব-হৃদয় স্বর্গ হয়;—অসুরদিগের প্রাধান্যে তাহাকে নরকে পরিণত করে।

৪০। বাহুবল ও বাহুসম্বল হারা হইলে যে হৃদয়াভ্যন্তরে লসম্বলের আকর অনুসন্ধান করে, সে সকল অবস্থাকে জয় করিয়া মুক্ত হয়।

৪১। কষ্ট পরীক্ষা সত্ত্বেও সত্যকে সর্ব্ব প্রযত্নে সমাদর করিতে শিক্ষা করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। অসত্য দ্বারা ধন, মান, সুখ, ঐশ্বর্য্য লাভ হইলে তাহা চির অনাদরের বিষয়, ইহা স্মরণ করিবে।

৪২। আত্মাদরের আধিক্য মনুষ্যের মহত্ত্বকে খর্ব্ব করে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির আতিশয্যে তাহার কল্যাণ নিয়তই বৃদ্ধি করে।

৪৩। শক্তি ও ঐশ্বর্য্য হেয় নহে,যদি মোহদ্বারা তাহা আচ্ছন্ন না হয়। অতএব মোহ-মায়া-বিবর্জ্জিত হইয়া উহার সদ্ব্যবহার কর; ইহা কালে সুখ ও পরকালে শান্তিলাভ করিবে।

৪৪। শিষ্যব্রত অবলম্বন কর; যৎসামান্য তৃণের নিকট তুমি শিখিবার অনেক বিষয় পাইবে। ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় প্রাণী ও পদার্থ যেন তোমার গুরু হইয়া তোমার উন্নতির সহায় হইবে। কিন্তু অহঙ্কারী ও অভিমানী হইলে সমস্ত ঘটনা তোমাকে পতনের দিকে লইয়া যাইবে।

৪৫। মনুষ্যের নিকট খাঁটী হইবার আশা,কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। বিবেকের নিকট খাঁটী হওয়াতে প্রকৃত কল্যাণ।

৪৬। যদি ধর্ম্মের মধুরতা সম্ভোগ করিয়া শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতে চাহ, তবে সরল ভাবে সাধন আরম্ভ কর। ধর্ম্মসাধন কি আড়ম্বর? তাহা নহে। সরল প্রাণ হইয়া যিনি ভগবানকে চাহিয়াছেন, তিনি তাঁহার দর্শন

লাভ করিয়া সার্থক হইয়াছেন। যুগে যুগে ইতিহাস এই সাক্ষ্য দিতেছে। শিশুর ক্রন্দনধ্বনি যেমন মাকে দূর হইতে নিকটে উপস্থিত করে, সরল সাধকের প্রার্থনা তেমনি জগজ্জননীকে প্রকাশিত করে, কেননা সরল সাধকের নিকট ভগবান আত্মস্বরূপ প্রকটন করেন। অতএব হে মানব! আড়ম্বরে পড়িয়া আত্ম-প্রবঞ্চিত হইও না, কিন্তু সরল সাধন আশ্রয় করিয়া সংসার-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গ-ধামে চলিয়া যাও।

৪৭। ধর্ম্মজীবন কতকগুলি অনুষ্ঠান বা ঘটনার সমষ্টি নহে। কিন্তু সংকল্প সাধন ও ব্রত পালন। নূতন বর্ষ আরম্ভ হইল, সংসারের কার্য্য সমাধার জন্য সকল রকমের কার্য্য বা ব্যবসায়ী নূতন প্রণালীতে কার্য্য আরম্ভ করিল,—নূতন খাতা খুলিল। ইহাতে ইহকালের কার্য্যের ব্যবস্থা ও সংস্থানের যোগাড় তুমি করিলে। কিন্তু ইহকালই কি তোমার পরি-ণামের পরিধি? তাহা ছাড়া যদি আর কিছু থাকে, তবে তাহার জন্য কি সম্বল, কি ব্যবস্থা করিলে? তাহা একবার চিন্তা কর; এবং জীবনের কার্য্য ঠিক করিয়া লও।

৪৮। ইহ সংসারের ধন, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য, বিভব, যাহা কিছু সম্বল, সকলি চঞ্চল,—অনিশ্চয়; এবং যাহা কিছু অনিশ্চয়, তাঁহাতেই আবার অধিক ভাবনা-ভয়। কিন্তু ভগবান্ নিত্য ও তাঁহার প্রেম অপরিবর্ত্তনীয়,—ইহা যে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করে, সেই ধন্য; কেননা সে ভয়কে জয় করিয়া, অভয় পদ প্রাপ্ত হয়।

৪৯। গর্ভাবস্থায় শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে,

সে সহজে স্বাভাবিক নিয়মে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়। তদ্বিষয়ে যত বৈলক্ষণ্য হয়, তাহার জীবনে তত বিঘ্ন ও বিড়ম্বনা ঘটে। আমাদের ইহ জীবন সেই রূপ। যেমন স্বাভাবিক নিয়মক্রমে আমরা এখানে প্রস্তুত হইব, তেমনি আমরা এখান হইতে পরকালে প্রস্তুতাবস্থায় সহজে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতে পারিব। নতুবা বিড়ম্বনা মায়াসম্ভূত যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়া অসম্ভব।

৫০। মানুষের মনের সঙ্গে কৃষকের ভূমির যে উপমা, তাহা অসার কবিত্ব বা কল্পনা নহে। বাস্তবিক এ উপমা গভীর তাৎপর্য্য পূর্ণ। কেননা কৃষক যেমন পরিশ্রম দ্বারা ভূমি কর্ষণ ও প্রস্তুত করিবে, যেমন বীজ বপন করিয়া তাহা যত্নসহকারে রক্ষা করিবে, তদনুরূপ ফল লাভে কৃতকার্য্য হইবে। কোন ক্রমে ইহার অন্যথা হইলে তাহার সব পরিশ্রম নিষ্ফল ও পণ্ড হয়। তদ্রূপ মনুষ্য জীবন। যেমন সাধুসঙ্গে, সুনীতি, সচ্চিন্তা, সদ্ব্যবহার, সদনুষ্ঠান ও শাসন প্রভৃতি দ্বারা ইহাকে প্রস্তুত করিবে, তেমনি ইহা হইতে উৎকৃষ্ট ফল প্রসূত হইবে। হে মানব! তাও কি তুমি জান না, হৃদয়-ভূমি আজব কারখানা, যতন করে ইহা চাষ কর না, নিশ্চয় ইহাতে ফলিবে সোণা।

৫১। বিশ্বস্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর কর; তাঁহার করুণায় নিরাশ হইও না। কারণ কথিত হইয়াছে যে, 'অবিশ্বাসী লোক ব্যতীত আর কেহ ঈশ্বরের করুণায় নিরাশ হয় না।'

৫২। অদৃষ্ট বা কপাল মন্দ, এ কল্পনা কেন কর? যদি

কপালে বিধাতা পুরুষ কিছু লিখিয়াছেন,—মনে কর, তিনি কখন মন্দ লেখেন নাই, ইহা বিশ্বাস করিয়া উদ্যমশীল হও; আর কাহারও কুহকে ভুলিও না;—কেন না ভুলাতে—ধোকা দিতে এ সংসারে অনেকে আছে। বিধাতার মঙ্গল-পুণ্য-হস্ত হইতে কখন অমঙ্গল পাপ লেখা হইতে পারে না, ইহা স্থির নিশ্চয় জানিয়া তাঁহার উপর আশা ভরসাও নির্ভর করিয়া আপনার লক্ষ্য সাধনে তৎপর হও; আশঙ্কা ভয় ভাবনা কিছুই তোমাকে বিপন্ন করিতে পারিবে না। অতএব অবস্থা বা মনুষ্যকর্তৃক পরিচালিত হইও না। ভগবান সহায়,—জানিয়া তাঁহা কর্তৃক পরিচালিত হইতে অভ্যাস কর।

৫৩। ভিতর বাহির, সব বস্তু সম্বন্ধে সম্ভব। ধর্ম্মকার্য্যে বাহ্য ও আন্তরিক অবস্থা আছে; বিচক্ষণ যাঁহারা, তাঁহারা সমত্তা রক্ষা করিতে যত্ন করেন। নিষ্ঠাবান যাঁহারা, তাঁহার দুইটীর সূক্ষ্ম রূপে অন্তর নিরীক্ষণ করেন। অসারতাপ্রিয় অজ্ঞানী লোকেরাই কেবল বাহ্যাড়ম্বরে ব্যস্ত হয়। সুতরাং যার যেমন মন, সে তেমনি ধন পায়, তুমি বুদ্ধিমান হইয়া হংসবৎ চতুরতা সহকারে অসার ছাড়িয়া সার গ্রহণ কর।

৫৪। পরীক্ষা শিক্ষার কারণ। যে ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরীক্ষায় পড়িয়া শিক্ষালাভ করিল, সতর্ক হইল, বৃহৎ পরীক্ষার সহিত তাহাকে আর সাক্ষাৎ করিতে হইবে না; অথবা সে প্রস্তুত থাকা প্রযুক্ত তাহা সহজে জয় করিতে সমর্থ হইবে। অবস্থা তাহাকে অবসন্ন করিতে পারিবে না। অতএব সতর্ক হইয়া পরীক্ষা হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া সংসারে নিরাপদ হও।

৫৫। পরীক্ষা শিক্ষার উপায়, অতএব সংসারের পরীক্ষায় ভীত না হইয়া শিক্ষিত হইবে।

৫৬। শিষ্যব্রত লইয়া তুমি ভবের বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতে আসিয়াছ,—ইহা যত স্মরণ করিবে, ততই শিক্ষালাভ হইবে।

৫৭। মোহ মনুষ্যকে জীবন্মৃত করে, জাগ্রতকে ঘুমন্ত-প্রায় করে, অতএব মোহ একটী সাময়িক বিকার। রোগ যেমন শরীরকে নষ্ট করে, মোহ তেমনি মনকে বিকৃত করে। অতএব এই দ্বিবিধ বিকার একান্ত পরিহার্য্য।

৫৮। আসক্তি পরিত্যাগ কর, পাপ প্রলোভন আপনা-পনই নিস্তেজ হইবে।

৫৯। তুমি যদি সুখী হইতে চাহ, তবে বাসনার আগুণ অন্তর হইতে নির্ব্বাপিত কর। আগুণ না নিবিলে শীতলতা আশা করা অসম্ভব। ব্রহ্মসাগরে ডুব দাও, বাসনার আগুণ নিবিবে; প্রাণ সহজে শীতল হইবে। ইহাই শান্তি ও সুখের উপায় জানিবে।

৬০। সাধন পরায়ণ হইলে সকল ধন অনায়াসে লাভ হয়। যে নিয়মাধীন ও ব্রতধারী হইয়া সাধন পরায়ণ হয়, নিত্যধন, ধর্ম্মধন তাহার অপ্রাপ্য নহে। যতনে রতন মিলে; সাধনে সিদ্ধি হয়। অতএব যত্ন সহকারে সাধনে প্রবৃত্ত হও; মতারত্ন লাভ করিয়া সব যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবে।

৬১। চিন্তা কার্য্যের প্রসবিনী। চিন্তা সৎ হইলে কার্য্য স্বভাবতঃ সৎ হইবে। অতএব সচ্চিন্তা পোষণ সর্ব্বতোভাবে করিবে।

৬২। ভূমি কর্ষণ করিয়া ভাল বীজ বপন করিলে সুফল লাভ করা সহজ হইবে। অতএব হৃদয়কে কর্ষণ কর, সচ্চিন্তা বীজ তাহাতে বপন কর, সৎকার্য্য সাধন করা সহজ হইবে। এজন্য উক্ত হইয়াছে 'হৃদয়কে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা কর; কারণ ইহা হইতে জীবনের প্রবাহ বিনিঃসৃত হয়।'

৬৩। ধর্ম্ম কি? যোগ ও কর্ম্ম—পূজা ও সেবা; ইহার সামঞ্জস্য শান্তি দান করে। ভগবানকে চাহিতে হইলে জীবের সেবাতে রত হইতে হইবে, নতুবা দেব প্রসাদ অসম্ভব। এজন্য মনুষ্যের পক্ষে নিত্য উপাসনা ও নিত্য সেবা নিতান্ত বিধেয়।

৬৪। সহিষ্ণুতা ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে নিতান্ত প্রয়োজন, নতুবা সাধন নিষ্ফল। এজন্য উক্ত হইয়াছে, সহিষ্ণুতার সহিত দৃঢ়নিষ্ঠ হও; কারণ ধার্ম্মিকদিগের সৌভাগ্য অবশ্য ফলিবে।

৬৫। সংসার-সাগরোপরি ধর্ম্ম-পোতারোহণ করিয়া ভগবানের কৃপা-পবনের সহায়তায় চলিতে থাক; সংসারের তুফান তোমাকে ভীত বা মগ্ন করিতে পারিবে না।

৬৬। সংসারে বিপদ প্রলোভনের তরঙ্গ নিয়তই চলিতেছে। নাবিক যেমন হাল ধারণ করিয়া নৌকা বাঁচায়, সাধক তেমনি ব্রতধারী হইয়া জীবন কাটায়।

৬৭। অন্ধকারে ভোগী ভীত হয়, যোগী যোগানন্দ সম্ভোগ করে, অতএব যোগীই প্রকৃত ভোগী, আর ভোগী দুঃখভাগী।

৬৮। ভোগী যখন জাগ্রত, যোগী তখন নিদ্রিত; আর ভোগী যখন নিদ্রিত, যোগী তখন জাগ্রত; এই জন্য যোগী সর্ব্বাবস্থার প্রশান্ত ও নিশ্চিন্ত।

৬৯। নিন্দা অপবাদে মন ক্ষুণ্ণ হয়, সুখ্যাতি প্রতিপত্তি লাভে উৎফুল্ল হয়, কিন্তু ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিতে পারিলে সাম্যভাব লাভ হয়। ইহাই প্রার্থনীয়।

৭০। সুনিদ্রা যেমন স্বাস্থ্যের পরিচায়ক, সচ্চিন্তা তেমনি মনের সুস্থতার লক্ষণ। অতএব উভয়বিধ স্বাস্থ্যভোগই সুখ ও আরামের কারণ।

৭১। সুখ দুঃখ গণনা না করিয়া কর্ত্তব্য পালন করাই শ্রেয়ঃ, কেননা কর্ত্তব্যপালনে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়।

৭২। যাহা উন্নতির পরিচয় দেয় না, তাহা মৃত্যুর প্রতিকৃতি। অতএব সেই ভাবে জীবন যাপন কর, যাহাতে নিত্য নূতন ভাবের সঞ্চার করতঃ উন্নতির পরিচয় দেয়।

৭৩। কে আমার, আমি কার, এই প্রশ্ন আপনাকে আপনি নির্জ্জনে নিয়তই জিজ্ঞাসা কর; দেখিবে ঘটনা, পার্থিব সম্বন্ধ ও নিজ জীবন সকলেই তোমাকে এই কথা বলিবে যে, ভগবানই আমার, আমিও ভগবানের, আর সব অসার—অনিত্য।

৭৪। সত্য, সাগর হইতেও গভীর এবং আকাশ হইতেও উচ্চ। অতএব ধৈর্য্যাভাবে তাড়াতাড়ি নিজ প্রবৃত্তির অধীন হইয়া যাহা কিছু একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বিপথগামী হইও না।

৭৫। পশুত্বের খোসা ছাড়াইয়া ফেল; মানুষ্যের ভিতরে পরদার পর পরদা; দেবত্ব ভিতরে দেখিতে পাইবে; তাহাতে মহত্ত্ব লাভ হইবে।

৭৬। আত্মাকে জিজ্ঞাসা কর, জানিতে পারিবে যে, পর

দুঃখে দুঃখী হওয়া বরং সহজ, কিন্তু পর-সুখে সুখী হওয়া বড়ই কঠিন।

৭৭। নিজের চরিত্র-দর্পণে অন্যের অবস্থা নিরীক্ষণ করিলে, বিচারে নিরপেক্ষতা সহজ হইবে।

৭৮। মত অসার, কাযও অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু সেই ব্যক্তিই ধন্য, যিনি মত ও কায দুইটীকে জীবনে মিলন করিতে পারিয়াছেন, কেননা এই মিলনে প্রকৃত চরিত্র সংরচিত হয়।

৭৯। প্রেম চির মধুর ও নিত্য নূতন, কেবল অবস্থা ও ব্যবস্থা ভেদে ইহা অন্যতর দেখায়।

৮০। সর্ব্বাপেক্ষা সহজ কি? উপদেশ দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কি? নিজকে জানা।

৮১। যদি সর্ব্বতীর্থময় হরিকে লাভ করিতে চাও, তবে হে মানব! দেহকে একটী পবিত্র মন্দির রূপে দেখিতে শিক্ষা কর; গৃহ ও কর্ম্মক্ষেত্র এক অত্যাশ্চর্য্য তীর্থ-স্থান মনে করিয়া রাখ, এবং সর্ব্বদা এই মন্ত্র জপ কর "গৃহ ধর্ম্ম নিত্য কর্ম্ম পরমসাধন, পবিত্র তীর্থ সংসার তপোবন।"

৮২। সমস্ত মাস পরিশ্রমান্তে ভৃত্য পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বেতন লাভ করিয়া থাকে, কেবল বেতন-প্রাপ্তির দিন উপস্থিত হইলে সে ফল লাভ হয় না;—তদ্রূপ জীবনের ভাব, চিন্তা কার্য্যেতে তুমি যে ভগবানের সেবক, ইহার প্রমাণ যদি না দেখাতে পার, তবে ৫ দিন কাল তীর্থ পর্য্যটন করিয়া, ২ দিন কাল যাগ যজ্ঞ করিয়া, ক্ষণকাল তপ জপ করিয়া তুমি ভগবানকে পাইবে যে আশা কর, সে তোমার নিতান্ত ভ্রম ও কল্পনা জানিবে।—কেননা ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রধান অনুজ্ঞা

বলিয়া উক্ত হইয়াছে "যে তুমি পরমেশ্বরকে সমুদায় হৃদয়ের সহিত, সমুদায় আত্মার সহিত ও সমুদায় মনের সহিত ভাল বাসিবে।"

৮৩। কখন কাহার মৃত্যু হইবে ইহার কিছুই স্থিরতা শক্রতা নাই, কিন্তু যদি মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত থাক, মৃত্যু তোমার করিতে পারিবে না। যাহারা অপ্রস্তুত, তাহারাই মৃত্যু-ভয়ে ভীত হয়।

৮৩। যে দূরদর্শী নয়, সে দুঃখ পায়; যে অপরিণামদর্শী, সে অর্ব্বাচীন। এজন্য পরকালে বিশ্বাস না হইলে ইহকালে সুস্থির হইবার আশা নাই। কেননা পরিণাম চিন্তা হরিনাম আশ্রয়ের কারণ।

৮৫। নিত্য আত্ম চিন্তা কর, কেননা আত্ম চিন্তা পরমাত্ম-চিন্তনে প্রবৃত্ত করিবে, এবং পরমাত্ম-চিন্তনে পরামার্থ ভাল হইবে।

৮৫। বৈরাগ্যের হোমাগ্নি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাক, বিলাসের পতঙ্গ তোমাকে আর স্পর্শ করিতে পারিবে না।

৮৬। সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মধন ভিক্ষা কর, তোমাকে আর অন্য ভিক্ষা করিতে হইবে না। হরি পদ আশ্রয় কর, সংসারে আর অন্য আশ্রয় নিষ্প্রয়োজন দেখিতে পাইবে।

৮৭। ভগবান ভক্তকে আপনার নিরাপদ ক্রোড়ে লুকাইয়া রাখেন, তাই ভক্তগণ নিশ্চিন্ত। ভক্তিপথ আশ্রয় কর, ইহার মর্ম্মজ্ঞ হইয়া সুখী হইবে।

৮৮। ধর্ম্মনিষ্ঠ হও, ইষ্ট ফল তোমার সকল কাজ হইতে প্রসবিত হইবে।

৮৯। যাহা কিছু পরবশ সকলই দুঃখের কারণ, যাহা কিছু আত্মবশ তাহাই সুখের হেতু, পৃথিবীর শাস্ত্রে ইহা সঙ্গত। কিন্তু ভক্তি-শাস্ত্রের উক্তি ইহার ঠিক বিপরিত।

৯০। সাধক! তোমার হৃদয় রত্নের খনি, খনন কর; ইহার ভিতরে অমৃতের উৎস দেখিতে পাইবে, ও অমূল্য রত্ন লাভ করিবে।

৯১। হে মানব! ইহা নিশ্চয় জানিও,—যাহা কিছু অনিষ্ট, সব তোমা হইতে। আর যাহা কিছু ইষ্ট, তাহা ঈশ্বর কৃপায়।

৯২। এ পৃথিবীর কিছুরই স্থিরতা নাই। ধন জন জীবন সকলই অস্থায়ী। ধর্ম্মধন একমাত্র পরম ধন। এ ধন উপার্জ্জনে যে ব্যক্তি উদাসীন, সে নিতান্ত কৃপামাত্র।

৯৩। মৃত্যু-ভয়ের অপেক্ষা এ সংসারে অধিকতর ভয়ের ব্যাপার আর কিছুই নাই। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় নাম সাধন ও স্মরণ, এ ভয় হইতে মুক্ত হইবার এক মাত্র উপায়।

৯৪। ভগবানে আত্ম সমর্পণ, ও তাঁহাতে নির্ভর ভিন্ন এ জীবনে নিশ্চিন্ত হইবার উপায়ান্তর নাই।

৯৫। মনুষ্যের বুদ্ধি, জ্ঞান শক্তি সামর্থ্য সকলই সীমাবদ্ধ। সংসাররূপ অকূল সাগরে পড়িয়া অনন্ত শক্তির আধার শ্রীহরির চরণাশ্রয় ভিন্ন আর গতি কোথায়?

৯৬। সংসার সমুদ্র বিশেষ। এখানে কত তুফান উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে। এ তুফানে ভগবান কর্ণধার, এই স্থির বিশ্বাস করিয়া তাঁহার চরণতরী আশ্রয় কর; তাঁর নামের সারি গাইতে থাক; দেখিবে, তুফানে পড়িলেও মানুষ মরে না।

৯৭। স্রোতস্বতীর প্রবল স্রোতে আবর্জ্জনা পড়িলে ভাসাইয়া সাগরে লইয়া ফেলিল, অগাধ জলরাশিতে তাহা ডুবিয়া গেল। অকৃত্রিম প্রীতির প্রস্রবণে তেমনি সংসারের অসার পদার্থ প্রেম সাগরে ডুবাইয়া দেয়। অতএব অকৃত্রিম প্রেমই সার সম্বল।

৯৮। বস্তু অবস্তু হয় কেবল অপব্যবহারে, প্রেম স্বর্গের সামগ্রী কিন্তু অপব্যবহারে ইহাও নরকের বস্তু হয়।

৯৯। অন্তর্নিহিত স্রোত যে জলরাশির মধ্যে নিয়ত যে বিদ্যমান, তাহাকে স্রোতস্বতী কহে। আভ্যন্তরিক ধর্ম্মভাব মানবের সকল অবস্থার মধ্যে বিদ্যমান, সেই মনুষ্যনামে বাচ্য।

১০০। কেবল বাহ্যাড়ম্বরে বা অনুষ্ঠানের জন্য ব্যস্ত হইও না। হৃদয়কে বিশুদ্ধ করিলে কার্য্য সহজে সুন্দর হইবে; যেমন বৃক্ষের মূলে জলসিঞ্চন করিলে, বৃক্ষ স্বাভাবিক নিয়মে সারবান হইয়া যথাসময়ে ফল ফুলে সুশোভিত হয়।

১০১। ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রত রাখিবেক, তাহা হইলে পাপ বিকারের প্রতিকার সহজ হইবে।

১০২। সাধন কর, বাঁধন কাটিবে; অসম্ভব সম্ভব হইবে; অন্ধকারে আলোক দেখিবে; সাধন-পরাঙ্মুখ জীব কেবল কল্পনার জালে জড়িয়া মরে।

১০৩। তোমার জীবন একটী পুষ্প ব্যতীত আর কিছুই নহে। যখন কুঁড়ি হয় তখন তুমি বালক; যখন প্রস্ফুটিত, তখন তুমি তরুণ যুবক; এবং যখন শুষ্ক হইতে থাকে, তখন তুমি বৃদ্ধ।

১০৪। বিশ্বস্ত রূপে তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য সুসম্পন্ন কর ঈশ্বর তোমার প্রতি সদয় হইয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন।

১০৫। অদৃষ্টবাদী হওয়া দুর্ব্বলতার লক্ষণ।

১০৬। পান ভোজন জীবনের অবলম্বন। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা, পান ও ভোজ্যের মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব অনুভব করেন।

১০৭। ধর্ম্ম যদি কেবল বাহ্যানুষ্ঠান ও বাহ্য কার্য্যের ব্যাপার হয়, তবে তাহাও অসার হৃদয়ের সামগ্রী হইলে, তবে তাহা নিত্য সম্বল হইবে, মিষ্ট আস্বাদন দিবে।

১০৮। বস্তু যতক্ষণ তরল অবস্থাপন্ন, ততক্ষণ তাহা চঞ্চল, আন্দোলন-পরবশ। তরল ঘন হইলে আর চঞ্চলতা বিকাশ করে না। মনের ভাব ভক্তি, তরল অবস্থার অতীত হইয়া যত ঘন হইবে, ততই অবস্থার বা ঘটনার আন্দোলনে আর তাহা অস্থির—চঞ্চল হইবে না। প্রশান্ত ভক্তের এই লক্ষণ জানিবে।

১০৯। রোগ নির্ণয় কর, তবে ঔষধ দ্বারা রোগ মুক্ত হইবে, এলোমেলো কেবল ঔষধ সেবনে কোন ফলোদয় নাই। সাধনের সন্ধান বাহির কর, তবে সিদ্ধি লাভ হইবে। নতুবা, কেবল কতকগুলা যাগ যজ্ঞ করিলে, ফল লাভের সম্ভাবনা নাই।

১১০। জীবনের লক্ষ্যকে দিক্‌দর্শনের শলাকা সদৃশ চির দিন স্থির করিয়া রাখ, কখন লক্ষ্যকে উপলক্ষ্য এবং উপলক্ষ্যকে লক্ষ্য করিও না। এ প্রকার লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইলে জীবনে তৃপ্তি ও নিশ্চিন্ততা দুর্লভ।

১১১। পরের লোপা কভু দিও না কাণে, কেড়ে লবে কখন কেবা তা জানে। হইওনা সভ্য বাহিরের শোভায়, কর একান্তে নিত্য পুণ্য সঞ্চয়।